স্রোতের গতি

শ্রীইন্দিরা দেবী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

১৩২৮, আশ্বিন

মূল্য ১॥০ টাকা।

প্রথম সংস্করণ
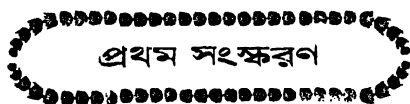
প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল
"সিদ্ধেশ্বর প্রেস"
৭৭নং, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

উৎসর্গ

প্রাণাধিকা

"প্রতিভা", "শান্তি" ও "মাধুরীর" করকমলে—

আশীর্ব্বাদিকা

মা—

"যথা রীতি-সরিৎস্রোতশ্চিরং বহতি সর্ব্বদা।
তথা বহতু তদ্ধাতু রাজ্যস্য, বাধনেন কিম্॥"

ভূমিকা

"স্রোতের গতি" "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

কলিকাতা
১লা আশ্বিন, ১৩২৮

শ্রীইন্দিরা দেবী প্রণীত

অন্যান্য গ্রন্থ

স্পর্শমণি (উপন্যাস) দ্বিতীয় সংস্করণ	২৲
সৌধরহস্য ঐ	১৲
পরাজিতা ঐ	১৲
নির্ম্মাল্য (ছোট গল্প) দ্বিতীয় সংস্করণ	১।॰
কেতকী ঐ	১৲
ঐ (আবাঁধা)	৸॰
ফুলের তোড়া দ্বিতীয় সংস্করণ	॥॰

স্রোতের গতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাসী বোন্‌ঝী
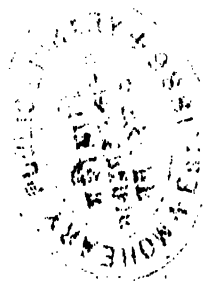
"বিবাহ-নিবারিণী" সভার সহকারী-সম্পাদিকা অমিয়ার 'ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা' হওয়ায়, সেদিন তাহার বাড়ীতে অনেকগুলি মহিলা-বন্ধুর সমাগম হইয়াছিল। বন্ধুরা রোগী দেখিতে—সহানুভূতি জানাইতে আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সুবাস-স্নিগ্ধ মূল্যবান্ প্রচুর পোষাক-পরিচ্ছদ, পরিপাটি কেশ-বিন্যাস প্রভৃতি দর্শকের চক্ষে উৎসব গৃহের সম্ভাবনারই ধাঁধা জন্মাইতেছিল।

'ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা' সংক্রামক জ্বর। তাই ইঁহারা অত্যন্ত সংক্ষেপে ও অল্পকালে যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি জানাইয়া, আল্‌গোছে থাকিয়া, বিদায়-গ্রহণ করিতেছিলেন। কি জানি, সংক্রামক রোগের জীবাণু অলক্ষ্যে কখন শরীরা-ভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া যায়! গৃহে সেদিন সকলেরই প্রায়

বিশেষ প্রয়োজন—দুই দণ্ড বসিয়া গল্প করিবারও অবকাশ নাই ইত্যাদি শিষ্টাচার-সম্মত বাঁধা বুলি চলিতেছিল। অমিয়া বিছানায় শুইয়া সকলের সহিত যথাযোগ্য আলাপ-সম্ভাষণ করিতেছিল।

হেমাঙ্গিনী অমিয়াদের সভার মেম্বার। সে রুমালে মুখ মুছিয়া, মাথার চুল দু-একটি যাহা স্থানচ্যুত হইয়া মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা ঘরের বড় আয়নাখানার পানে চাহিয়া সুবিন্যস্ত করিয়া লইয়া ক্ষীণস্বরে কহিল—"ভাল ক'রে চিকিৎসা করান্—অসুখের সময়—আমার মনে হয়—ও পুরুষ-ডাক্তার দেখানই ভাল। যতই হোক্ ওঁরা হাতেকলমে শিক্ষা পেয়েছেন বেশী কিনা, রোগ-নির্ণয়ে ওঁদের ক্ষমতা বেশী, তা' অবশ্য স্বীকার করতে হবে।"

বিধুমুখী কহিলেন—"আমিও সেই কথা বলি, সভা কর যা কর—ওঁদের বাদ দিতে গেলে কি চলে? না না, চিকিৎসার সঙ্গে ছেলেমানুষি কোরো না। একজন বড় নামজাদা কোন ডাক্তারকে ডাক। লেডি ডাক্তারদের কর্ম্ম নয় এসব।"

মিসেস্ নাগ অনেকদিন হইতেই এই বুদ্ধিমতী সুন্দর মেয়েটিকে একটু বিশেষভাবে স্নেহ জানাইয়া আসিতেছেন। তাঁহার আশা আছে, অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার ইংলণ্ডপ্রবাসী

ভাগিনেয়ের জন্য এই পুরুষ-বিদ্বেষিণী মেয়েটির বিমুখ মন একদিন তিনি ফিরাইয়া আনিতে পারিবেন। তাই তাঁহার টান কিছু বেশী,—কহিলেন—"ও-সব সভা-টভার হাঙ্গাম তুমি ছেড়ে দাও বাছা, এই শরীর নিয়ে খেটে-খেটে শেষে কি একটা বিপদ্ বাধিয়ে বস্‌বে? বরং বিকেল-বেলা আমার ওখানে মধ্যে-মধ্যে যেও। ডলি, অফি এসেচে ছুটিতে, মাঝে মাঝে গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে এস। আগে শরীর তারপর অন্য কিছু। আমি গাড়ী পাঠিয়ে দেব, যেও মাঝে-মাঝে—বুঝ্‌লে?"

অমিয়া ধন্যবাদ জানাইয়া কহিল—"সুবিধা হয় ত খবর দেবো।"

"না বাছা, সুবিধা-টুবিধা ওসব চালাকী আমি শুন্‌ব না—যেতেই হবে" বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বাহিরে তাঁহার মোটরের হর্ণ ঘন ঘন শব্দ করিয়া ত্বরা জানাইয়া দিতেছিল।

অমিয়ার মাসীমা সত্যবতীকেও অনেকে অমিয়ার শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখিবার অযাচিত উপদেশ দিলেন। সত্যবতী শুধু একটুখানি হাসিলেন, কোন জবাব দিলেন না। বিদায়-পর্ব্ব সারিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। মাথার যন্ত্রণায় অমিয়া "আঃ উঃ" করিতেছিল। সত্যবতী

মাথার কাছে বসিয়া সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

এই দুইটি মাত্র নারীকে লইয়া ইহাঁদের ক্ষুদ্র সংসারটি গঠিত হইয়াছিল। অমিয়ার মা যেদিন বিপত্নীক পিতার হাতে এগারো মাসের শিশু অমিয়াকে সঁপিয়া দিয়া পর-লোকের পথে যাত্রা করিলেন, সেদিন রোগে ও শোকে অকালবৃদ্ধ ত্রিপুরাচরণের এই শিশুর ভার, দুঃসহ বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু নিরানন্দ মৃত্যুপুরীর ন্যায় নির্জ্জন এই অন্ধকার-গৃহে যখন শিশু-কণ্ঠের কলহাস্য আবার জীবনের চাঞ্চল্য জাগাইয়া তুলিল, তখন বৃদ্ধের জীবন-সায়াহ্নটা আবার সহনীয় ও বহনীয় বলিয়া মনে হইল। এই মেয়েটিকে খেলা দেওয়া, সঙ্গ দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া, যত্ন করাই যেন তাঁহার জীবনের একমাত্র কার্য্য হইয়া উঠিল। ইহাকে ছাড়িয়া তিনি কোথাও যাইতে পারেন না, এক মুহূর্ত্ত চোখের বাহিরে রাখিতে অন্ধকার দেখেন। মেয়েটিও তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসিত। কান্নাকাটি ছিলই না। শিশুকাল হইতে নারীহীন সংসারে পুরুষ-সাহচর্য্যে বর্দ্ধিত হওয়ায়, তাহার ধরণ-ধারণে বালিকা-ভাবের পরিবর্ত্তে বালকের ভাবই অধিক দেখা যাইত। হাঁড়িকুঁড়ি পুতুল লইয়া খেলার চেয়ে বই বগলে স্কুলে

যাওয়া, কঞ্চির তীর ধনুক, ঘুড়ী লাটাই লইয়া খেলা করা—তাহার ভাল লাগিত। মেয়েটির বয়োবৃদ্ধির সহিত ত্রিপুরাচরণ তাহাকে লেখাপড়া শিক্ষা দিতেছিলেন। মেধাবিনী বালিকা অতি দ্রুত শিক্ষা করিয়া মাতামহকে বিস্মিত ও পুলকিত করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু এ অনাবিল শান্তি-সুখটুকুও ত্রিপুরাচরণের অদৃষ্টে সহিল না।

অমিয়ার মা ছাড়া তাঁহার আর এক কন্যা ছিল। ছোট মেয়ে সত্যবতীর অল্প-বয়সে বিবাহ হইয়াছিল—সেই পর্য্যন্ত সে শ্বশুরগৃহেই বাস করিতেছিল। ত্রিপুরাচরণ মেয়েকে আনিবার জন্য অনেকবার চেষ্টা করিয়া শেষে হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। লোকমুখে মধ্যে-মধ্যে জামাতার দুশ্চরিত্রতা ও দুর্ব্বৃত্ততার সংবাদ পাইতেন। নিরুপায়ে নীরবে সহ্য করিয়া থাকা ছাড়া তাঁহার আর উপায় কি ছিল? অমিয়ার প্রতি অধিক মনোযোগী হইয়া তাই তিনি মনের ক্ষোভ মিটাইতে চাহিতেন।

বালিকা-বধূ সত্যবতীর স্বামীর নিকট অমানুষিক নির্য্যাতনভোগ ছাড়া অন্য কোন পাওনাই ছিল না। স্বামীকে সে যমের ন্যায় ভয় করিত। তিনি সজ্ঞানে বাড়ী আসিলে সে যে কোথায় গিয়া লুকাইবে, তাহার স্থান খুঁজিয়া পাইত না। পৌষ মাসের দারুণ শীতে একবস্ত্রা

বালিকা ছাদের চিলের ঘরের কার্ণিশের ধারে উবুড় হইয়া পড়িয়া থাকিত। কখনও অন্ধকারে আমবাগানে গাছের তলায়, অথবা পুকুরঘাটের অব্যবহৃত ভগ্ন অংশে, লেবু-গাছের ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া থাকিত। সাপের ভয়, কাঁটার ভয়, ভূতের ভয়ও তাহার স্বামীর ভয়ের কাছে তুচ্ছ ছিল। পরদিন বাড়ীর লোকে যখন তাহাকে আবিষ্কার করিত, তখন সেই মৃতপ্রায় ভয়ার্ত্তা বালিকার উপর স্বামীর যে অমানুষিক অত্যাচার চলিত, তাহা কোন মানুষে যে মানুষের উপর করিতে পারে, তাহা মনে হয় না। বধূর 'একগুঁয়েমি'র জন্য বিরক্তচিত্ত হৃদয়হীন সংসারের লোকেরাও তাহার রক্ষার উপায় দেখিত না—ছাড়াইয়া লইত না। পদাঘাতে মূর্চ্ছিতা, মৃতপ্রায় পত্নীকে ফেলিয়া রাখিয়া স্বামী যখন বীরদর্পে বাহির হইয়া যাইতেন, তখনও কেহ কাছে আসিয়া, একটা সান্ত্বনার ভাষা ব্যবহার করিত না। মেয়েমানুষের এত 'গোঁ'—'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল'—ইহাতে বলিবার কথা ছিলই বা কি ?

এমনি করিয়া জীবনের স্মরণীয় সুদীর্ঘ চারিটি বৎসর কাটাইয়া, চতুর্দ্দশবর্ষীয়া সত্যবতী একদিন শুনিল, লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন এবং সধবার সর্ব্ব-সৌভাগ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া তাহার অভাগা স্বামী তাহাকে চিরদিনের জন্যই

মুক্তি দিয়া গিয়াছেন। বেশ্যালয়ে অত্যধিক মদ্যপানে যকৃৎ বিদীর্ণ হইয়া তাঁহার অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটিয়াছে। শুনিয়া বাড়ীর আর সকলের সহিত সেও প্রথমটা খানিক কাঁদিয়াছিল। তারপর, হাতের লোহা, চুড়ী খুলিয়া, সিঁদূর মুছিয়া শান্তমুখে বিধবার বেশ গ্রহণ করিল।

এবার ত্রিপুরাচরণ মেয়েকে লইয়া যাইতে চাহিলেন—কেহ আর কোন আপত্তি করিল না। 'অপয়া' 'রাক্ষসী' বধূ বিদায় হওয়াই সংসারের পক্ষে মঙ্গল—এই বয়সে যাহার অনাচারে স্বামী মরিল, তাহার সংস্পর্শে না জানি আবার কি বিপদ্ ঘটিবে?

শাশুড়ী কাঁদিয়া কহিলেন—"বাছা আমার যে ক'দিন বেঁচে ছিল, এ হতভাগী রাক্ষুসীর জ্বালায় হাড়েনাড়ে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এক দিনের তরে সংসারের সুখ পেয়ে গেল না। ওর নিশ্বাসে-নিশ্বাসে শুখিয়ে কাট হ'য়ে গেল। নৈলে সে কি আমার যাবার ছেলে? ওর জ্বালাতেই না মন্দসঙ্গ করতে শিখেছিল, নৈলে বাছা আমার কখন উপরপানে চোক তুলে চাইতে জানত না। দেখ্‌চ না, রাঁড় হ'য়ে যেন ষাঁড় হয়েচে। সে চোরের মতন ভয়ে-ভয়ে চাউনিও নেই, কিছুই নেই, ওর আর কি? যেতে দুঃখিনীর ধন আমারই গেল।"

বধূর প্রতি আক্রোশে তাঁহার মনে পড়িল না যে, সপ্তদশ-বর্ষীয় পুত্রের দুশ্চরিত্রতার ভূরি-ভূরি প্রমাণ পাইয়াই তিনি অনেক চেষ্টায় তাড়াতাড়ি তাহার বিবাহ দিয়া চরিত্র-সংশোধন করিতে চাহিয়াছিলেন। যে কার্য্য শাসনভয়-প্রদর্শন প্রভৃতিতে তাঁহাদের দ্বারা সম্পন্ন হয় নাই, একটি ভয়চকিতা দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার শক্তিতে তাহা হইল না বলিয়াই তাঁহারা জাতক্রোধ হইয়া উঠিলেন। দুরূহ কার্য্যে তাহার সহায় হইলেন না, সান্ত্বনা দিলেন না, সহানুভূতি দেখাইলেন না। পশুপ্রকৃতি স্বামীর চিত্তবিনোদনে অসমর্থ বলিয়া তাঁহারাও তাহাকে নির্য্যাতন করিতে ছাড়িলেন না। মানুষ দুর্ব্বলের প্রতি এমনি করিয়াই অবিচার করে।

স্বামীদত্ত আঘাতের অলঙ্কার-চিহ্ন সর্ব্বাঙ্গে বহন করিয়া, তাঁহারই স্মরণার্থ বাকী জীবনের সমস্ত সুখ-সাধে জলাঞ্জলি দিয়া, অনেক দিনের পর সত্যবতী আবার তাহার স্নেহময় পিতৃ-ক্রোড়ের নিরাপদ আশ্রয়নীড়ে ফিরিয়া আসিল। বাপের চোখের জলের সহিত চোখের জল মিলাইয়া সে আজ নিজের জন্য কাঁদিতে পারিল না। তাহার জ্বালাময় অশ্রুহীন নেত্র নিয়ত অর্থহীনভাবে চাহিয়া থাকে। মুখে চোখে শোক বেদনার কোন ছায়া ফুটে না। শান্তি বা

তৃপ্তির তাহার আর ছিলই বা কি যে পাইবে? বাহির হইতে তাহাকে দেখিয়া অনেকে মনে করিত, স্বামীর নির্য্যাতন-অত্যাচারের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া অকাল-বৈধব্যেও সত্যবতী হয়ত মনে-মনে খুসী হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলিব তাহা নহে। সত্যবতী খুসী ত হয়ই নাই, বরং তাঁহার শোচনীয় পরিণামে ব্যথিতই রহিয়াছিল। কিন্তু সে দুঃখ তাহার নিজের জন্য নহে। 'আমার কি হইল' তাহাতে এ ভাব ছিল না, 'তোমার কি হইবে' এই চিন্তাই তাহাতে বর্ত্তমান। মনের যখন এমনি অবস্থা, তেমনি সময় বালকণ্ঠের মধুমাখা স্বরে মাতামহের শিক্ষানুসারে 'মা' বলিয়া ডাকিয়া অমিয়া মাসীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইল—দু'খানি কোমল বাহুলতায় তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল। তখন সুখদুঃখের অতীত অবস্থা হইতে ধীরে-ধীরে সত্যবতীর সংসার-বিরাগী চিত্ত আবার সংসারের মায়াজালে কেমন করিয়া যে বাঁধা পড়িয়া গেল, তাহা সেও অনুভব করিতে পারিল না। বালিকার 'মা'-ডাক বড় মধুর, বড় স্নিগ্ধ লাগিলেও সত্যবতী তাহাকে মা বলিয়া ডাকিতে দিল না। যে নারী স্ত্রীর অধিকার লইল না—মনে-প্রাণে স্ত্রী হইতে পারিল না, 'মা' হইবার অধিকার তাহাকে কে দিয়াছে? না—সে 'মা' নয়, সুধু মাসী!

জীবনে স্বামীকে সে ভালবাসিতে পারে নাই। তাঁহার মৃত স্মৃতিকে পূজা করিতেও পারিল না। সত্যবতী এখন আর বালিকা নাই—তাহার জীবনের আকস্মিক পরিবর্ত্তন সুধু অবস্থায় নয়, তাহার শরীর-মনেও গভীর ছায়া ফুটাইয়া, হাত বুলাইয়া দিয়া গিয়াছিল, যৌবনেই তাহাকে প্রৌঢ়ার মত দেখাইত। বিধবার আচার সংযম সাধন সমস্তই সে খুঁটাইয়া পালন করিত। আর, বাপ ছাড়া জগতের পুরুষ-জাতিকে সে ঘৃণা করিত। অমিয়ার বাপের হৃদয়হীনতা তাহার এই অশ্রদ্ধার অনলে আহুতি যোগাইয়া দিল। ভগিনীপতি তাঁহার নিজের সংসারে এমনি তদ্গতচিত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, একদিন পত্রদ্বারাও মেয়ের একটা কুশল সংবাদ লইবার সময় করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সত্যবতীর মনে হইল, সাধারণ পুরুষের কাছে পত্নীপ্রেম ও সন্তানবাৎসল্যের মূল্য তবে একই!

সংসারের নানা প্রতিকূল ঘটনায় এ বিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ়ই হইতেছিল। বাড়ীর পাশেই এক অবিবাহিতা ইংরাজ-মহিলার বাসা। জানালায় দাঁড়াইয়া সত্যবতী তাঁহার সহিত গল্প করিত। আর খ্রীষ্টীয়-সমাজে বিবাহিতা নারীমণ্ডলীর ভূরি-ভূরি দুরবস্থার কাহিনী সংগ্রহ করিয়া লইত। মাসীর শিক্ষা অনুসারে অমিয়া যদি কোনদিন

শাড়ীর আঁচল মাথায় দিয়া বলিত,—“মাছীমা, আমি ছছুলবালী দাব”—সত্যবতী বাধা দিয়া কহিত—“ছিঃ শ্বশুরবাড়ী যেতে নেই, সেখানে ‘জুজু’ থাকে। তুমি আমার কাছে থেকো—কক্ষনো শ্বশুর-বাড়ী যেও না।” বালিকা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথার কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া, হাত দিয়া চোখ মুছিয়া বলিত—“ছিঃ, ছছুবালী দুত্তূ—দেতে নেই—দাব না।”

সত্যবতী হাসিয়া মেয়েকে বুকে তুলিয়া লইয়া বলিত—“মনে রেখো—আলেয়া দূর থেকেই আলো দেখায়, কাছে এলে গলা টিপে ধরে।”

ত্রিপুরাচরণের ভিতরটা রোগে শোকে অন্তঃসারশূন্য হইয়া গিয়াছিল। একবার একটু বেশী জ্বর হওয়ায় সে ধাক্কা আর সামলাইতে পারিলেন না। অনাথিনী কন্যা ও দৌহিত্রীর চিন্তা করিতে করিতেই তিনি এখানকার হিসাব মিটাইয়া দিলেন।

পিতার মৃত্যুতে সহায়হীনা সত্যবতী ভগিনীপতিকে উচিত বোধে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল—“তাহার জন্য না হউক, অমিয়ার জন্যও এখানকার বিষয়-সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া একমাত্র ত তাঁহারই উচিত কার্য্য।” ভগিনীপতি নিমন্ত্রিতের মত কেবল শ্রাদ্ধের দিন একবার

দর্শন দিয়াই চলিয়া গেলেন। বাড়ীতে স্ত্রীর শরীর খারাপ—ছেলের পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী, ছোট মেয়েটির সর্দ্দি দেখিয়া আসিয়াছেন, বিলম্ব করিবার ত উপায় নাই! নহিলে এসব হাঙ্গাম পোহান' ত তাঁহারই কর্ত্তব্য। কিন্তু কি করিবেন, তিনি যে একান্তই নিরুপায়।

বাবা আসিয়াছেন শুনিয়া অমিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিয়াছিল। এখন আর সে নিতান্ত ছোটটি নাই। নিজের অবস্থা অনেকখানি বুঝিতে পারে। স্কুলের মেয়েদের বাড়ী গিয়া দেখে, তাহাদের অনেকেরই বাবা আছেন। বাবা কত ভালবাসেন, কত আদর করেন, সে মনে মনে ভাবে, কবে তাহার বাবা তাহাকে দেখিতে আসিবেন, আসিলে সে আর সহজে ছাড়িয়া দিবে না। মাসীমার অনুমতি লইয়া সে একবার তাহার বাবার বাড়ী দেখিয়া আসিবে, তাহার ছোট ছোট ভাই বোন্ গুলিকে আদর করিবে, ভালবাসিবে। মাসীমার কাছে এসব কথা সে কিছুই বলে না, বলিতে সাহসও করে না। তাহার কারণ, সে বুঝিতে পারে, মাসীমা তাহার ভাই বোন্ গুলিকে ভালবাসেন না—আর তার বাবাকে ঘৃণা করেন। তাই অনেক দিনের রুদ্ধ উচ্ছ্বাস সহসা ছুটিয়া বাহির হইতে গিয়া আবার বাধাপ্রাপ্ত হইয়া, এক মুহূর্ত্তে থমকিয়া

ফিরিয়া গেল। অমিয়া পিতাকে প্রণাম করিলে, তিনি সবিস্ময়ে এই অপরিচিতা সুন্দরী মেয়েটির পানে চাহিয়া আছেন দেখিয়া, একজন পরিচয় করাইয়া দিলেন—"এটি আপনারই মেয়ে যে—অমিয়া—"

'ওঃ' বলিয়া পিতা কন্যার প্রতি সকল কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট ভদ্রলোকটির সহিত আবার আপনার আলোচ্য-বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন—"ছেলেটির অসাধারণ মেধা। বেঁচে থাকে যদি, দেখে নেবেন মশাই, নিজের সন্তান বলে বাড়িয়ে বল্‌চি বলে যেন ভাব্‌বেন না—কালে সে একজনা হবে, দেখে নেবেন। ওর গর্ভধারিণীও এই কথা বলেন,—বলেন, তাঁর বরাতে এমন হীরের টুক্‌রো ছেলে বাঁচ্‌লে হয়! এই ধরুন্ না—একটা সামান্য উদাহরণ দিই। বল্লে না প্রত্যয় যাবেন, কি অসাধারণ মেধা আর উপস্থিত বুদ্ধি এইটুকু ছেলের। সেদিন ওদের ইস্কুলের প্রমোশন হ'ল। অনেক ছেলে প্রাইজ্ পেলে, বঙ্কু আমার খালি-হাতে বাড়ী এল দেখে আমি বল্লাম—'কৈ বঙ্কু তোমার প্রাইজ কৈ?' তাতে ছেলে কি জবাব দিলে জানেন মশাই? বঙ্কু আমার হেসে বল্লে—"প্রাইজ ত ভারী,—ক'খানা বই আর একটা ঘড়ি! আমার ত আর বইয়েরও অভাব নেই, ঘড়িরও

অভাব নেই, দু-দুটো ঘড়ি আমার নিজের। টাকা দিলেই বাজার থেকে অমন কেন ওর চাইতে ঢের ভাল ভাল বই এক্ষুণি সর্দ্দার গিয়ে কিনে এনে দেবে। বিনয় শিশির ওরা গরীবের ছেলে, বাপের জন্মে কখনো ত ঘড়ি দেখেনি —ওরাই দেখুক্। ইচ্ছে কল্লে আমিই কি আর সেকেণ্ড্ হ'তে পাত্তুম না? দয়া করে কেবল হইনি—তাই ওদের লম্ফঝম্প!"

এই অপরিচিত পিতা এবং ততোধিক অপরিচিত সন্তান-বাৎসল্য বালিকার স্নেহপিপাসু চিত্তে সবলে একটা বেদনার আঘাত দিয়া মুহূর্ত্তে তাহাকে ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিল। তাহার কালো চোখে জল ভরিয়া আসিয়াছিল; পাছে এ দুর্ব্বলতাটুকু বাপের চোখে পড়ে এই ভয়ে সে আস্তে আস্তে চিরদিনের জন্যই পিতৃসান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিল। সারাজীবনের পিতৃস্নেহের এইটুকু স্মরণ-চিহ্নই তাহার সম্বল। নিজের ঘরে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কেনই যে সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়াছিল, তাহার কারণ হয় ত সে নিজেই জানিত না।

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া মনের ব্যথা যখন কমিয়া আসিল, সে উঠিয়া মাসীমার খোঁজে গেল। সত্যবতী তাঁহার একমাত্র স্নেহময় আশ্রয় পিতার শ্রাদ্ধকার্য্য সমাধা করিয়া,

সেই মাত্র পিতার একখানি আলোকচিত্রের কাছে মাটিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিতেছিলেন। মুখেও মৃদু মৃদু দুইটি শব্দ উচ্চারিত হইতেছিল—"বাবা বাবা"! যে প্রিয়-সম্বোধন চিরদিনের জন্যই ফুরাইয়াছে, তাহার লোভটুকু যে এখনও ষোল আনাই অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। অমিয়া নিঃশব্দে মাসীমার অনুকরণে তেমনি করিয়াই মাটিতে মাথা লুটাইয়া মাতামহের চিত্রের কাছে প্রণত হইল। মনে হইতেছিল, দাদামহাশয় স্বর্গে বসিয়া আজ তাহার দুরবস্থা দেখিয়া হয় ত হাসিতেছেন—"কেমন বড় যে বাবার নিন্দা কর্‌লে কোঁদল কর্‌তিস্—এখন কেমন জব্দ! বাবা একটা কথাও ত কইলে না!"

সত্যবতী প্রণাম সারিয়া মাথা তুলিতেই অমিয়া আস্তে আস্তে তাঁহার কোলের কাছে ঘেঁসিয়া সরিয়া বসিয়া ডাকিল—'মা'। সত্যবতী চমকিয়া তাহার বিষণ্ণ মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন; গভীর স্নেহে একটুখানি কাছে টানিয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন—'মা তোমার স্বর্গে আছেন অমি, তিনি যে পুণ্যবতী ভাগ্যবতী, তাই মার কোলে বাবার কোলে আজ তাঁর স্থান! তোমার বাবার কাছে গেছ্‌লে?"

অমিয়া মাথা হেলাইয়া জানাইল—গিয়াছিল।

"কিছু বল্লেন? তোমায় ডাক্‌লেন কাছে?"

সত্যবতীর মুখে উদ্বেগচিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। মেয়ে মাথা নাড়িয়া জানাইল—"না।" চোখের জল পাছে মাসীমার চোখে পড়ে, তাই মুখ না ফিরাইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

এ ছলনাটুকু মাসীমার চোখে কিন্তু চাপা রহিল না। উদ্বেলিত নিশ্বাসটা জোর করিয়া চাপিয়া ফেলিয়া কহিলেন —"কাঙ্গালীরা বোধ হয় খাচ্চে, ওদিক্‌টায় ভারী গোলমাল হচ্চে, চল্ দেখি—দেখে আসি তারা সব পাচ্চে টাচ্চে কি না!"

অমিয়া তাড়াতাড়ি হাত দিয়া চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সত্যবতী বাহিরে আসিলে সে তাঁহার অনুসরণ করিয়া চলিতে চলিতে কহিল—"দাদামশাই কাঙ্গালীদের খাওয়াতে কত ভালবাস্‌তেন—ও বচ্ছর পুরীতে যেদিন কাঙ্গালী-ভোজন করান হ'ল, দাদামশাই নিজে হাতে থালা নিয়ে, আমের ঝুড়ি নিয়ে সব পরিবেশন করতে লাগ্‌লেন। সেখানে কিন্তু বেশ—না মাসীমা? কম্ পড়্‌লে বাজার থেকে ভাত তরকারী কিনে আনা যায়। দ্রৌপদী বলে—ঠাকুরের প্রসাদ কণারত্তি মুখে দিলে পেট ভরে যায়। কৈ আমার ত তা যেত না, বরং সুমুদ্দুরের হাওয়া খেয়ে-খেয়ে এখানকার চার-ডবল খিদেই হ'ত—তোমার হ'ত না মাসীমা?"

সত্যবতী একটা ছোট রকম নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন —"হ'ত বোধ হয়! চল অমি, আমরাও নিজে-হাতে ওদের পরিবেশণ করি গিয়ে, বাবা স্বর্গে থেকে দেখ্‌তে পেলে তৃপ্তি পাবেন।"

বালিকার বিস্মৃতপ্রায় বেদনা আবার সহসা বাজিয়া উঠিল। সে বিষন্ন-মুখে কহিল—"সকলের বাবা এক রকম হয় না—না মাসীমা? তোমার বাবা খুব ভাল!"

এমন সময় সত্যবতী খবর পাইলেন—জামাইবাবু বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিলম্ব করিবার সময় নাই— বাড়ীতে ছেলে-মেয়েদের কাহার-কাহার শরীর খারাপ দেখিয়া আসিয়াছেন; বাড়ীর ভিতর গেলে আবার বিলম্ব হইয়া পড়িবে, তাই বাহির হইতেই চলিয়া গিয়াছেন। বলিয়া গিয়াছেন, এ দিকের গোলমাল চুকিয়া গেলে অবসরমত একদিন তখন দেখা করিয়া যাইবেন, আজ বড়ই তাড়াতাড়ি।

শুনিয়া সত্যবতী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এই আত্মীয় বান্ধব ও অভিভাবকহীন সংসারে অনাথা বিধবা ও বালি- কার একমাত্র অভিভাবক যে এখন একমাত্র উনিই! বিষয় সম্পত্তি যাহা আছে তাহার, আর এই দুইটি শোকার্ত্তা নারীর রক্ষণাবেক্ষণের কোন ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া—ইহা

কি উঁহারই কর্ত্তব্য ছিল না? মনে হইল, জগতের পুরুষমাত্রই তবে এমনই অন্তঃসারশূন্য। সন্তানবাৎসল্য উহাদের স্বার্থের দ্বারে মাথা গলাইতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গীয় পিতৃমূর্ত্তি স্মরণ হওয়ায় সত্যবতী মনে মনে প্রণাম করিয়া ভাবিলেন—"বাবা ত সাধারণ পুরুষদের আদর্শ ছিলেন না। তাই চোদ্দ বছর মৃত স্ত্রীর স্মৃতির গৌরব রক্ষা করেছিলেন। আর অমির বাপ — ছিঃ!"—সত্যবতী সবেগে চিন্তার ধারা ফিরাইয়া লইলেন। অমিয়াকে, যদি সম্ভব হয়, তিনি আজীবন অনূঢ়াই রাখিয়া দিবেন। পুরুষের ছদ্মবেশ-ভেদের দক্ষতালাভে যখন তাঁহার পিতাও সমর্থ হন নাই, তখন তাঁহারই বা আশা কোথায়? কোন্ অকৃতজ্ঞ হৃদয়হীন পুরুষের হাতে তিনি তাঁহার এই লোকললামভূতা স্নেহের ধনকে তুলিয়া দিবেন? লোক-নিন্দা সমাজচ্যুতি—তা সে মাথার মণি করিয়া সগর্ব্বে বহন করিবেন—তবু প্রাণ ধরিয়া পাষাণের কণ্ঠে মুক্তামালা দুলাইবেন না।

সত্যবতীর মনে পড়িতেছিল তাঁহার বাল্যসখী কিরণের কথা। আহা, অভাগিনি কিরণ! রূপ দেখিয়া বিনা পণে যে দিন ধনীগৃহে তাহাকে লইয়া যায়, পাড়ার লোকে বলিয়াছিল,—"কিরণের বাপ ভারী জিতিয়াছে।" কিন্তু

সে মত বছর না ফিরিতেই তাহাদের বদল করিতে হইয়াছিল। বিবাহের পর প্রথম যেদিন দুই সখীতে মিলিত হইলেন, সত্যবতীর মনে পড়ে, কিরণকে তিনি আরও কত সুন্দর দেখিয়াছিলেন। কিরণের সুখের কথার সেদিন যেন আর শেষ হইতেছিল না। স্বামীর আদর সোহাগ ভালবাসার অফুরন্ত কথায় সে যেন মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল। নিজের সৌভাগ্য-গর্ব্বে মাটীতে পা পাতিয়া চলিতেও যেন তাহার বাধিতেছিল, চোখে-মুখে হাসিতে কি অপরূপ শ্রদ্ধা ও প্রেম ফুটিয়া উঠিয়াছিল! সত্যবতী অবাক্ হইয়া সেদিন ভাবিয়াছিলেন, কি তপস্যা করিলে কিরণ হওয়া যায়—অমনি করিয়া স্বামীর রূপগুণের, স্নেহ ভালবাসার কাহিনী শুনাইতে পারা যায়? হায়, তখন কি তাঁহারা জানিতেন যে বিদ্যুৎশিখা শুধু পথিককে পথভ্রান্ত করিয়া অন্ধকারের গাঢ়ত্বই বাড়াইয়া দেয়! বিলাসী ধনীযুবকের রূপের মোহ দুই দিনেই ফুরাইয়া গেল। পত্নীপ্রেমে তাহার তৃপ্তি হইল না।

বিধবা হইয়া সত্যবতী যেদিন ফিরিয়া কিরণের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে তাহাকে দেখিতে গেলেন, সেদিন আনন্দময়ী কিরণের কঙ্কালসার ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া, লোকের মুখে তাহার বিবাহিত জীবনের পরিশিষ্টটুকু শুনিয়া তাঁহার মনে হইল,

দুর্ভাগ্যে কিরণ তাঁহাকেও জয় করিয়াছে। তাঁহার স্বামী তাঁহাকে দিয়া বারাঙ্গনার পরিচর্য্যা করাইয়া লন নাই। সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে দিয়াই সপত্নীকে বরণ করাইয়া ঘরে তুলেন নাই। তাহার পর আসন্নমৃত্যু বুঝিয়া চাকর দিয়া তাঁহাকে একবস্ত্রে বাপের বাড়ী পাঠাইয়াও দেন নাই। তবু কিরণ মরণকালেও সেই স্বামীকে দেখিতে, তাহার পায়ের ধূলা পাইতে চাহিয়াছিল। তাহার শেষ-দৃষ্টি শেষ-বাক্য সেই পাষণ্ডের উদ্দেশেই ব্যয়িত হইয়াছিল। "এলেন না? জন্মশোধ একবার দেখে যেতে পেলুম না?"—এই ছিল তার শেষ-কথা। সে নিজের ললাটে হাত দিয়া বলিয়াছিল, সবই তাহার ভাগ্য; স্বামীকে সে এজন্য কোন কটু কথা বলে নাই, নিন্দা করে নাই। জন্মান্তরে যেন তাঁহাকে সুখী করিতে পারে, ইহাই ছিল তাহার কামনা। হা রে অভাগিনি নারি! অস্থি-মজ্জায় অন্তরে-বাহিরে দাসীত্বের শৃঙ্খল কি এমনি করিয়াই পরিতে হয়? এ হীনতার বন্ধন কি জন্মান্তরেও মুক্ত হইবার নয়? যদি কামনার কিছু থাকে, চাহিতেই যদি হয়, তবে বল— "হে ভগবন্, নারীজন্ম যেন আর না হয়।"

এই মাসীমার শিক্ষা ও সাহচর্য্যে শৈশব অতিবাহিত হওয়ায়, যৌবন অমিয়াকে যে পুরুষদ্বেষিণী করিয়া তুলিবে,

ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই ছিল না। প্রতিবেশিনী ইংরাজ-কুমারী হেলেন অমিয়াকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহারই চেষ্টায় অমিয়ার স্কুলে ও বাড়ীতে উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিবাহ-নিবারিণী সভার তিনি একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষিকা। তাঁহারই চেষ্টায় কলেজ হইতে বাহির হইয়া অমিয়া এই সমিতির সংস্রবে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মিস্ চৌধুরীর ডাক্তারী

রাত্রে অমিয়ার জ্বর একশো পাঁচ ডিগ্রী উঠায়, সত্যবতী ভীত হইয়া ডাক্তারকে ডাকিতে পাঠাইলেন। পুরুষবিদ্বেষী সংসারে প্রাইভেট্ ডাক্তারের কার্য্য করিতেন মিস্ চৌধুরী। ডাক্তার কহিলেন—"জ্বরটা ইনফ্লুয়েঞ্জা! রেষ্ট নেওয়া ভারী দরকার। সময়টা বড্ডই খারাপ প'ড়েচে কি না। ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে টপ্ ক'রে নিউমোনিয়া হ'য়ে পড়্চে। আজকাল আমরা তাই নিউমোনিয়া ধ'রেই চিকিৎসা ক'রে থাকি। সে যাক্—তোমার কিন্তু তা মনে হ'চ্চে না। এই মিক্শ্চারটা লিখে দিচ্চি, দু' ঘণ্টা অন্তর বার-চারেক খাবে। কিন্তু আমি তোমায় বল্চি, তুমি ভাল ক'র্চ না অমিয়া! বাতি দুদিকে জ্বেলেচ, এত পরিশ্রম সইবে না ত তোমার! দিনকতক বিশ্রাম নাও। না হয় কোথাও একটু চেঞ্জে ঘুরে এস। খুব উপকার পাবে।"

অমিয়া মৃদু হাসিয়া, মাথার বালিসের নীচে হইতে ছোট নোটবুকখানি বাহির করিয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিতে

দেখিতে কহিল—"তা ত হ'তে পারে না এখন—এই দেখুন না কতগুলি এন্‌গেজমেণ্ট র'য়েছে আমার এ মাসে। এই—সভারই য়্যানিভার্সারির সময় এসে গেল। নাঃ — কল্‌কাতা ছেড়ে এখন এক পাও আমার যাবার উপায় নেই।"

মিস্ চৌধুরী নিজেও স্বাধীনা নারী। জীবনযাত্রার জন্য এই শিক্ষিতা মেয়েটি এই পথই বাছিয়া লইয়াছিলেন, পুরুষদের সহিত সমকক্ষতা লইয়া বিবাদ ঘোষণার তাঁহার কোন প্রয়োজন হয় নাই। অমিয়ার কথায় ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া তাচ্ছীল্যের ভঙ্গীতে কহিলেন—"এঃ — হবে না আবার? খুব হবে! আমি বল্‌চি হবে। দু'মাস সহর ছেড়ে বাইরে গেলেই তোমার কুমারী-সভা ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে প'ড়ে যাবে না গো? আর যায়ই যদি, তবে তা'কে ভাঙ্গতেই দাও। যাতে ভাঙ্গন ধ'রেচে, তাকে মাটী ফেলে ফেলে কাঁহাতক্ আর আট্‌কে রাখ্‌বে?"

অমিয়া অপ্রতিভের ক্ষীণ হাসি হাসিয়া কহিল—"আচ্ছা ভেবে দেখি, সম্পাদিকা দার্জ্জিলিং যাচ্চেন, না হয় তাঁরই সঙ্গী হওয়া যাবে।"

মিস্ চৌধুরী বাধা দিবার ভাবে কহিলেন—"তবেই হ'য়েচে মনিকাঞ্চনযোগ! না না—অমন কাজটি কোরো না। তার সঙ্গে যাবার অর্থ—তোব্‌ড়া তুব্‌ড়ী খাতাপত্র

ঘাড়ে ক'রে যাওয়া ত ? তা হ'লে বিশ্রাম পাচ্চ কোথায় ? তিনি না হয় নির্ব্বাণ-চিন্তায় ব্যাকুল হ'য়ে শরীরের উপর জুলুম চালাচ্চেন। সকলের ত তা ক'ল্লে চল্‌বে না! তোমরা ছেলেমানুষ, তোমাদের শরীর মন তাজা রাখা চাই, তবে না—ঘরে বাইরে কাজে লাগ্‌বে।"

সত্যবতী এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, এইবার অবকাশ বুঝিয়া কহিলেন—"যা বলেচ ভাই। ওঁর ধরণ-ধারণ পোষাক আসাক দেখ্‌লে আমাদেরও অস্বস্তি লাগে। যেন পৃথিবীর সঙ্গে কোন খোঁজখবর নেই, পৃথিবীর মানুষই নন্। মাথার চুলগুলি ত বাবুইয়ের বাসা হ'য়ে উড়্‌চে। চিরুণী ছোঁয়ানও বোধ হয় নির্ব্বাণ-পথের বাধা! কিন্তু মানুষটা লেখে বড় সুন্দর। ঐ যে বৌদ্ধধর্ম্মের কথা-টথা গেল-মাসে ওঁদের কাগজে বেরিয়েছিল না, চমৎকার লিখেছিল, কি নামটা রে অমি ?" বলিয়া অমিয়ার পানে কটাক্ষে চাহিয়া লইয়া পুনরায় মিস্ চৌধুরীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"তা, তুমি ওকে বুঝিয়ে সুজিয়ে যা হয় ক'রে দাও ভাই। ওর চেহারা দেখে ভয়ে ত আমার মুখে অন্নজল যেতে চাইচে না। খেতে পারে না কিচ্ছু—মাথার যন্ত্রণা ত চব্বিশ ঘণ্টা। এত বলি যে লেখাপড়ার কাজ দিন কতকের জন্যেও না হয় বন্ধ রাখ্—তা কথা কি শোনে, না গ্রাহ্য

করে? ঐ এক বুলি—চল্‌বে না, সম্পাদিকা বেজার হবেন। এমন ক'ল্লে বাঁচ্‌বি কেমন কোরে বাপু?"

কথা-শেষের সঙ্গে সঙ্গে সত্যবতীর চোখেও জল আসিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার দুঃখময় জীবনের একমাত্র আশাজ্যোতিঃ এইটুকুকে অবলম্বন করিয়াই—যে তাঁহার বাঁচিয়া থাকা।

মিস্ চৌধুরী তাঁহার স্থূল দেহখানি দুলাইয়া অবজ্ঞাভরে কহিলেন—"সম্পাদিকা বেজার হবে—ওঃ ভারী ত।—তোমায় জিরেন্ নিতে হবে। কোথায় যাবে বল দেখি? আচ্ছা দেখ—মিনার ওখানে যেতে পার ত। এক্কেবারে সেকেলে জায়গা—চমৎকার স্বাস্থ্যকর, তোমার পক্ষে ঠিক্ উপযোগী হবে। আধুনিকতার গন্ধও সেখানে নেই। সত্যিকারের বিশ্রাম পাবে।"

অমিয়া কহিল,—"কিন্তু তাঁদের ওখানে সে মেয়েদের থাক্‌বার মত—"

"না গো লক্ষ্মি, স্যানিটেরিয়ম ট্যাম নেই কিছু সেখানে। তা হলই বা, তারা ভারী অতিথিপরায়ণ। বল্‌চি কি তবে, এক্কেবারে পৌরাণিক—দেশটিও—দেশের মানুষগুলিও। আমার অবশ্য আপন জন,—সেজ্‌দির মেয়ে; গত বৎসর সেখানে গিয়ে দু'মাস যখন থেকে এলুম—ইচ্ছে হ'চ্ছিল না যে ফিরে আসি!"

সত্যবতী তাঁহার স্থূল দেহের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া হাসিয়া কহিলেন—"তা মিথ্যে বলনি ভাই, দেহখানি যা গ'ড়ে এনেচ, একেবারে পৌরাণিক কালের ইট্ দিয়েই গাঁথা, অল্প ঝড়ে ভাঙ্গচে না।"

দুই বন্ধুতে বেশ একটু হাসিতামাসা চলিল। মিস্ চৌধুরী কহিলেন—"মাসীর আঁচল ছেড়ে দু'দিন বাইরে একটু ঘুরে এস অমি, বেশ সেরে যাবে। খাসা জায়গা।" —ইহার পর সুন্দর হল্‌দে রঙ্গের একটি ছোট বাড়ী, লতাপাতা-ঘেরা ছবির মত একখানি বাগান, গোচারণের সবুজ মাঠ, স্বল্পতোয়া বঙ্কিমগতিশালিনী নদীটির পর্য্যন্ত এমন একটি মনোরম বর্ণনা দাখিল করিলেন যে, সম্পূর্ণ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও অমিয়ার "না" বলিবার সাধ্য রহিল না। থাকার সম্বন্ধে বন্দোবস্তের ভার ডাক্তার নিজেই লইলেন। হোটেলখরচা তাহারা নাই বা লইল? ইচ্ছা থাকিলে ঋণ পরিশোধের উপায়ের অভাব হয় না। উঠিবার সময় সত্য-বতীকে কহিলেন—"আস্‌চে শনিবার ওকে আমি নিজে গিয়ে ট্রেণে তুলে দিয়ে আস্‌ব—সেখানে দু'একদিনের ভেতরেই চিঠি দেব। এর মধ্যে সেরে ওঠা চাই।"

নির্দ্ধারিত দিনে মাসীমাকে প্রণাম করিয়া, অমিয়া তাহার অল্পস্বল্প লগেজপত্র লইয়া যাত্রা করিল। মিস্

চৌধুরী প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাহাকে ট্রেণে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন। অমিয়াকে কহিলেন—"মিনাকে আমি চিঠি দিয়েছি, তার বাড়ীর গাইয়ের খাঁটী দুধে, আর যত্নে সে যেন তোমাকে মোটাসোটা ক'রে ফেরৎ পাঠাতে পারে।"

অমিয়া হাসিয়া আপত্তির সুরে কহিল— "দুধ—বাঃ, দুধ কি আমি কক্ষণো খাই নাকি? জিজ্ঞেস্ কর্‌বেন মাসীমাকে, ওটা আমি কত পছন্দ করি।"

মিস্ চৌধুরী হাসিমুখে উত্তরে কহিলেন— "দুধ কখনও খেয়েচ কি যে পছন্দ কর্‌বে? স্বোয়াদ্ জান্‌বে কোত্থেকে?" কলিকাতার বাজারে ও গোয়ালারা যে দুগ্ধ বা নানাদ্রব্য মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের জলীয় পদার্থ বিক্রয় করিয়া থাকে, তাহার প্রতি কটাক্ষ করিয়াই ডাক্তার এই মন্তব্যটি প্রকাশ করিলেন। কহিলেন—"দু'মাস সেখানে থেকে ত এসো, দেখ্‌বে—সব কাজের জন্যেই উপযুক্ত হ'তে পার্‌বে। কিন্তু মনে থাকে যেন, সুধু বিশ্রাম, আর কিচ্ছু না—বেশ ক'রে গরম কাপড় টাপড় ঢাকা দিয়ে ঘরের বাইরে বাগানে, মাঠে যেখানে খুসী কেবল বেড়িয়ে বেড়াবে, বসে থাকৃবে, শুয়ে থাকৃবে। তার পর ফিরে এসে যে বইখানি বার কর্‌বে, তাতে স্ত্রীর বিদ্রোহঘোষণার সঙ্গে এমন চমৎকার

রং ফুটে উঠ্‌বে যে, তাতে ক'রে তোমার স্বপক্ষ বিপক্ষের দল মুগ্ধ হ'য়ে যাবে।"

অমিয়া ঈষৎ প্রতিবাদের সুরে কহিল—"তাতে যে পল্লীচিত্র দেব এমন ত কোন সঙ্কল্প নেই আমার!"

"তা ত নিশ্চয়ই। এই চাকার তলায়ই ঘুর্‌চ কিনা! পল্লীচিত্রের কল্পনা কর্‌বে কোত্থেকে? দেখ বাছা, একবার বাইরে বেরোবার দরকার হ'য়েচে তোমার। ভারী সহুরে মেয়ে তুমি! তোমাদের বিশ্বাস, সহরের ভোগের জন্যেই ভগবান কেবল পাড়াগাঁয়ের সৃষ্টি ক'রেচেন। সহরের বাইরে যাওনি ত কখনও? বড় যদি গিয়েচ ত বালীগঞ্জ ভবানীপুর বা বেহালা—ব্যস্, এই ত তোমাদের পল্লীর আইডিয়া? ওখানে যাও ত একবার—দেখ্‌বে কত নূতন নূতন লেখার জোগাড় আপ্‌নি হ'য়ে যাবে। তোমরা যে সব 'পদদলিত স্ত্রীজাতি'র দুঃখের কান্না কাঁদ্‌চ, তারা কারা গো? এই সব সহুরে মেয়ে, যাঁরা গান-বাজ্‌না, সভা-সমিতি ক'রে বেড়াচ্চেন, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখ্‌চেন, বক্তৃতা দিচ্চেন, নভেল লিখ্‌চেন, তাঁরা? না, যারা পৃথিবীর মাখন যোগাচ্চে, ধান ভানচে, সুতো কাট্‌চে! বোঝাও না তাদের গিয়ে?"

হুইসিল্ দিয়া ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিল। স্পষ্টবাদিনী মিস্ চৌধুরীর বক্তৃতার বাকী মন্তব্যটুকু অব্যক্তই রহিয়া

গেল। অমিয়া কথার উপর জোর দিয়া কহিল—"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই তা আমি বোঝাব! নমস্কার!"

মিস্ চৌধুরীর তোব্ড়া গাল দুটি বিদ্রূপের হাসিতে আরও যেন তুবড়িয়া গেল। "পৌঁছেই একটা চিঠি দিও, বুঝ্লে?"

"নিশ্চয়ই—মাসীমার খবর নেবেন, ভারী একা হ'য়ে গেলেন তিনি। আবার বল্‌চি, নিশ্চয়ই তা আমি বোঝাব। সেখানেও আমি নিশ্চেষ্ট থাক্‌ব না।"

অমিয়ার কথার সঙ্গে সঙ্গেই, মিস্ চৌধুরীর মুখের হাসি না মিলাইতেই, ট্রেণখানি ভস্ ভস্ শব্দ করিয়া প্লাট্‌ফরম্ ছাড়াইয়া ক্রমে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রবাসে

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় ট্রেণখানি তাহার মন্থরগতি একটি জঙ্গলময় ক্ষুদ্র ষ্টেশনের ধারে সংযত করিল। কোন আরোহীই সে ষ্টেশনে নামিল না। অমিয়া—কুলীর জন্য বারকতক ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া নীল বা খাকী রঙের জামাপরা কুলীবেশী কাহাকেও দেখিতে পাইল না। ক্ষীণ-স্বরে বারকতক "কোলী, কোলী" করিয়া উদ্দেশে হাঁকা-হাঁকির পরে, ট্রেণ বেশীক্ষণ দাঁড়াইবে না বুঝিয়া নিজের লাগেজ-পত্র টানাটানি করিয়া নিজেই নামাইয়া লইল; এবং পরক্ষণেই রক্তচক্ষু সর্পগতি ট্রেণখানি শব্দ করিয়া ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া গেল।

অমিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিল, ষ্টেশনে কেহই তাহাকে নামাইয়া লইতে আসে নাই। অবশ্য এজন্য তাহাকে কষ্ট করিয়া ষ্টেশনের বাহিরে খোঁজ লইতে যাইতে হয় নাই। কারণ—'বাহির' বলিয়া এখানে বিশেষ কোন

আলাদা জায়গা ছিল না। একখানি মাত্র ঘর, আর তাহার সাম্‌নে খানিকটা জায়গা টিনের ছাদ দিয়া ঢাকা। ইহাই হইল ষ্টেশন। ঢাকা জায়গাটিতে মালপত্র নামান ওঠান বা রাখা হয়। যাত্রীরাও এইখানে বসিয়া থাকে। ষ্টেশনের বাহিরে কোথাও জন-মানবের চিহ্ন দেখা যাইতেছিল না। কেবল দূরে একজন বুড়ী-ধোপানী কাপড়ের মোট মাথায় লইয়া চলিতেছিল। দূরে যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে, শুধু সবুজ শস্যের ক্ষেত। আরও দূরে, মেঘের সঙ্গে মেশামিশি পাহাড়ের দৃশ্য। অমিয়া একটি নিশ্বাস ফেলিয়া নিজের জিনিষপত্রের পানে তাকাইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মনে মনে বলিতেছিল—"এ একটি ঘুমের দেশ। না—দেশ বলাও ঠিক্ হবে না, ঘুমন্ত উপত্যকা।" সাদা ধুতির উপর আধময়লা ছিটের কোট গায়ে, আধাবয়সী ষ্টেশনমাষ্টার-বাবুটি দড়িবাঁধা টিনের চশমাখানি, নাকে আঁটিয়া, মুখ নীচু করিয়া কতকগুলি কাগজপত্রের উপর ঝুঁকিয়া কি লিখিতেছিলেন। একখানি মাত্র কাঠের চেয়ার ও একটি বার্ণিশওঠা টেবিল মিলিয়া সবসুদ্ধ তাঁহার সম্পত্তি। অমিয়া উপায় না দেখিয়া অগত্যা তাঁহারই শরণ লইল। দরজার কাছে গিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল—"ঠিকা-গাড়ী কোথায় পাওয়া যায় মশাই?"

ষ্টেশন-মাষ্টার অবাক্ হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। কহিলেন—"শোন কথা,—ঠিকে গাড়ী! ওগো বুঝেচি—বুঝেচি, ঠিকে গাড়ী আর বুঝি নে? সে এখানে পাবেন কোথায়? সে প্রায় দশ মাইল দূরে পাওয়া যায়।"

অমিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে কহিল—"বয়েল-গাড়ী?"

ষ্টেশন-মাষ্টার হাতের কাগজখানি সরাইয়া রাখিয়া আর একখানি কাগজ বাছিতে বাছিতে কহিলেন—"গরুর গাড়ী—ওঃ? তা, আজ ত হাটবার নয়! আজ আর কোথায় পাবেন? সে, হাটের দিন চেষ্টা কল্লে এক আধ খানা ধর্‌তে পারা যায় বটে।"

"কুলী—মুটেও কি মেলে না মশাই এ দেশে?"

ক্রমেই হতাশায় তাহার গলার স্বর ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল। ষ্টেশন-মাষ্টার মুখ তুলিয়া মেয়েটির ক্রোধ বিরক্তি ও নৈরাশ্যপূর্ণ মুখখানির পানে একবার চাহিয়া একটু নরম স্বরে কহিলেন—"কুলী ষ্টেশনেরই যা একজন আছে। তা, সে ত এখন রাঁধ্‌তে-খেতে বাড়ী চ'লে গেল, এখুনি ত তাকে আর পাওয়া যাবে না। তার বাড়ী সেই—গাঁয়ে।"

"প্রাণতোষ-বাবুর বাড়ী কোথায় জানেন? না—তাও জানেন না? বেঙ্গল টিম্বরের এজেন্ট্ প্রাণতোষ-বাবু?"—

বলিয়া অমিয়া তাহার প্রশ্নের প্রতিকূল উত্তর শুনিবার জন্য বিরক্তমুখে উত্তরদাতার দিকে চাহিয়া রহিল।

ষ্টেশন-মাষ্টার তাহার মনোভাব বুঝিয়া, শ্লেষপূর্ণ একটুখানি কৃপার হাসি হাসিয়া কহিলেন—"জানি বৈকি! তা সেখানেই যদি যাবেন, ত একটু আগে থাকৃতে খবর দিলেই হ'ত। তাঁর নিজের দু-দু'খানা গরুর গাড়ী রয়েচে। একখানা এক পয়সার পোষ্টকার্ড লেখার ওয়াস্তা, ঠিক্ থাকৃত সব। এই কাল এখানকার ডাক্ বিলি হ'য়ে গেল। এখন ত দুদিন আর চিঠিপত্র বিলিও হবে না—রওনাও হবে না।"

এই নূতন খবর শুনিয়া অমিয়ার মুখখানি একেবারে পাঙ্গাস হইয়া গেল। সে তাহার শুভানুধ্যায়িনী উপদেশদাত্রী মিস্ চৌধুরীর উপর মনে মনে বড়ই রাগ করিতেছিল। ষ্টেশন-মাষ্টার তাহাকে সচেতন করিয়া দিলেন, কহিলেন—"ঐ যে ডানদিকের পথটা সোজা চলে গিয়ে বাঁদিকে ঘুরেচে ঐটে ধরে চলে যান্—আপনিই পথ দেখ্‌তে পাবেন। এই রাস্তাটা পেরুলেই বাড়ীটা নজরে প'ড়্‌বে। হল্‌দে রঙের বাড়ী—সাম্‌নে গেটের উপর লতাগাছ দেওয়া। মালপত্র এখানেই সব প'ড়ে থাক্ না, কাল প্রাণতোষবাবু গরুর গাড়ী পাঠাবেন অখন।"

ঘৃণা ও বিরক্তিতে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া অমিয়া কহিল—"থাক্, তাঁকে আর অত কষ্ট করতে হবে না। ফের্‌বার গাড়ী কখন ?"

"ভোর ছ'টায়। ঐ একমাত্র গাড়ী, আর ফের্‌বার গাড়ীটাড়ি নেই"—বলিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার অপ্রসন্নমুখে নিজের কাজে মন দিলেন। অমিয়া অগত্যা তাঁহার নির্দ্দেশানুযায়ী পথেই অগ্রসর হইতে বাধ্য হইল। মালপত্র ষ্টেশনেই পড়িয়া রহিল। পথের বাঁক ফিরিতেই একটা ঝরণা দেখা গেল। ঝক্‌ঝকে রূপার পাতের মত, সরু জলধারাটি ধীরভাবে বহিয়া চলিয়াছে। দু'ধারে উচ্চ সবুজ ঘাসে ঢাকা তীরভূমি. যেন সবুজ ছাঁটা-পশমের আসনের মত সুন্দর দেখাইতেছিল। স্বচ্ছ জল সান্ধ্য সূর্য্যালোকে কোথাও বা ঝক্ ঝক্ করিতেছিল—কোথাও বা ঘূর্ণ্যমান বীচিবিক্ষোভিত! পারাপারের জন্য ছোট একটি বাঁশের দোলা সেতু। তাহারই গায়ে, ছোট একটি লম্বা টিনের বাক্সের উপর লেখা "নেকৃষ্ট্ ক্লিয়ারেন্স্।" কলিকাতার ঘণ্টায় ঘণ্টায় ডাক্ বিলির কথা মনে করিয়া, ক্রোধ দুঃখ ও অভিমানে তাহার চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠিল, এখানকার লোকগুলার উপর অশ্রদ্ধায় তাহার এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। হতভাগা ডাক্তার—কলিকাতায়

ফিরিয়া সে আগে ডাক্তারকে দেখিয়া লইবে! কেন সে এমন করিয়া তাহার সহিত শত্রুতা সাধিল?

ঘণ্টাখানেক পথশ্রমের পর সে বুঝিতে পারিল, এবার তাহার ঈপ্সিত স্থানের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। রাস্তা—সে কি সোজাসুজি সমতল পথ?—উঁচু-নীচু, নালা খাল, পাথরের ঢিবি, কোথাও ঝোপ-ঝাপ, কাঁটাগাছ, কত বাধা বিপত্তি যে দলন করিয়া চলিতে হইতেছিল; রেশমী শাড়ীর আঁচলে টান পড়ে, ফিরিয়া ছাড়াইয়া লইতে হয়। সুদৃশ্য পাম্প-সু জুতা-যোড়াটি রাস্তার ধূলায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। দুর্ব্বল শরীরে পথের ও মনের কষ্টে এক একবার তাহার মনে হইতেছিল যে, এত দুঃখ সহিয়া শরীর সারান'র চেয়ে কলিকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জায় মরিয়া যাওয়াও তাহার ঢের ভাল ছিল। এইবার সে সমতল জমি পাইয়াছে। বড় বড় খামার, গোশালা, ধানের গোলা, মরাই চোখে পড়িতেছিল। এ সব গোলা, মরাই তাহার অদৃষ্টপূর্ব্ব; কেতাবে পড়া থাকিলেও চোখে না দেখায় ইহাদের মর্ম্ম তাহার সম্পূর্ণ বোধগম্য হইতেছিল না। রাস্তার বাঁক ফিরিতেই সম্মুখে একটি বড় একতলা বাড়ী। তাহার গেটের উপর গোলাপী ছোট ছোট ফুলভরা, সবুজ লতাগাছগুলি চক্ষুকে তৃপ্তিদান করিতেছিল। গেটের

দু'ধারে দুটি মোটাসোটা ধব্‌ধবে সাদা "পাহাড়ী গাই" যেন শত্রুকে দুর্গ-প্রবেশে বাধা দিবার জন্যই তাদের লম্বা বাঁকা শিং লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাদের বড় বড় চোখেও যেন বিস্ময়চিহ্ন ফুটিয়া রহিয়াছে। অমিয়া সভয়ে পিছু হটিয়া বলিয়া উঠিল—"ওমা, দেশের যে সবই চমৎকার, এ গরু দুটোকে আবার তাড়াবে কে ?"

গেটের ভিতরে সুস্থদেহা একজন স্ত্রীলোক, ছোট একটি মোটাসোটা সুশ্রী ছেলেকে কোলে করিয়া বেড়াইতেছিলেন। অমিয়ার সভয় মন্তব্য কাণে যাওয়ায় অথবা তাহাকে দেখিতে পাইয়া, তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"চিন্‌তে ত পাচ্চিনে আপনি কে ? কোথা থেকে আস্‌ছেন বলুন দেখি ?" রমণীর চোখে কৌতূহলের সহিত একটুখানি সম্ভ্রমও ফুটিয়াছিল। এমন দর্শনীয় মূর্ত্তি এখানে ত বড় বেশী চোখে পড়ে না ! তা ছাড়া এখানকার অল্পস্বল্প নরনারী সকলেই প্রায় তাঁহার পরিচিত। অমিয়া নিরুৎসাহভাবে কহিল—"এখানেও তাহ'লে গলদ্‌ দেখ্‌চি ! লেডি-ডাক্তার মিস্‌ চৌধুরী আপনাকে চিঠি লিখে আমার আস্‌বার খবর দিয়েচেন বলেই ত আমি জান্‌তাম্‌। এখন দেখচি তা দেন্‌ নি তিনি !"

রমণী সহাস্যে কহিলেন—"ওঃ—মাসীমা বুঝি পাঠিয়েচেন আপনাকে? না, না, গলদ্ আবার কিসের? এখানে ডাক্ ত রোজ বিলি হয় না,—চিঠি আস্‌বে'খন পরে। আসুন না, ভিতরে আসুন, বাইরে রইলেন কেন? ষ্টেশন থেকে পথটুকুও ত বড় কম নয়? কষ্ট হ'ল আপনার খুবই"—বলিয়া রমণী অবলীলায় গরু দুটির গায়ে হাত দিয়া একটুখানি ঠেলিয়া দিতেই তাহারা পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

অমিয়া রমণীর পশ্চাতে চলিয়া, লাল রংকরা সানের মেঝেওয়ালা বড় একখানি ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরের ভিতর আস্‌বাব পত্র অল্প-স্বল্প, কিন্তু সবগুলিই সুরুচির পরিচায়ক। বড় বড় খড়খড়িওয়ালা জানালা দু'টি খোলা রহিয়াছে। তাহার বাহিরের দৃশ্য অমিয়ার এতক্ষণের দুঃখ যেন অনেকখানি ভুলাইয়া দিল। বাহিরে সুন্দর একটি ফুলের বাগান,—সবুজ গাছগুলি নানাবর্ণের অজস্র ফুলে-ফুলে ভরা, দুই চক্ষু জুড়াইয়া দিতেছিল। জানালার ধারে নরম গদির উপর সাদা কাপড়ের ঘেরাটোপ-মোড়া বড় একখানি তক্তাপোষ। গৃহকর্ত্রীর অনুমতির অপেক্ষামাত্র না করিয়াই অমিয়া তাহার উপর শুইয়া পড়িল। মনে মনে বলিল—কাল ভোর ছ'টার ট্রেণে যতক্ষণ না সে এই

পাণ্ডব-বর্জ্জিত গ্রাম হইতে বাহির হইতে পারে, ততক্ষণের জন্য এই আরাম-শয্যা তাহারই ; এখান হইতে কিছুতেই সে আর নড়িবে না।

রমণী কহিলেন—"আপনি বড় ক্লান্ত হয়েচেন দেখ্‌চি। খোকাকে একটু ধরুন দেখি, আমি এখনি এলুম ব'লে। আমার ঝিয়ের মেয়ের আজ বিয়ে, সে চারদিনের ছুটি নিয়েছে। ছেলেটা যা দুরন্ত হয়েচে, ওকে নিয়ে কিছু যে কর্‌ব তার যোটি নেই। আপনি একটু রাখুন, আমি টপ্ ক'রে কিছু খাবার নিয়ে আসি।"

উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই নির্ব্বাক্ অতিথির কোলের কাছে ছেলেটিকে বসাইয়া দিয়া তাহার মা তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া গেলেন। অমিয়ার জীবনে সে আর কখনও কোন ছোট ছেলেকে কোলে করিয়াছে বলিয়া তাহার স্মরণই হয় না! একটুখানি গাল টিপিয়া, বা এতটুকু স্পর্শ করিয়া দু'টা যা-তা কথা বলিয়া নিতান্ত নিরুপায়স্থলে কাজ সারিয়া থাকিতেও পারে। কিন্তু তাই বলিয়া এই বাতাসা-রস-সিঞ্চিত, ময়লা জামা-পরা রোরুদ্যমান ছেলেটিকে লইয়া সে তখন কেমন করিয়া কি করিবে? মা চলিয়া যাইতেই ছেলেটি কান্না সুরু করিয়া দিল। ছেলেটির নরম নরম মোটা মোটা গড়ন, রাঙা রাঙা ফুলো ফুলো গাল

দু'টি আর চক্‌চকে চোখ—এই সব সম্পত্তি থাকায় অমিয়ার মন্দ লাগিতেছিল না। কিন্তু ছেলেটি তার আশ্রয়দাত্রীর অপরিচিত মুখ পছন্দ করিতেছিল না, অত্যন্ত বিরক্তিপূর্ণ মুখে সে অমিয়ার পানে চাহিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। পাছে তাহার লালার রসে কাপড় চোপড় খারাপ হইয়া যায়, সেই ভয়ে অমিয়া তাহাকে আলগোছে ধরিয়া রাখিয়াছিল, ইহাও খোকার বিরক্তির দ্বিতীয় কারণ। অমিয়ার হাতে রিষ্টওয়াচের উপরও তাহার চক্ষু ছিল, কিন্তু তাহার অপরিচ্ছন্ন হাতে সেটি দিতে অমিয়ার মোটেই ইচ্ছা হইতেছিল না। এই সকল বাধা ও ঈপ্সিত বস্তুটি না পাওয়ায় এবং অমিয়ার কোলে লইবার সঙ্কোচ-কুঞ্চিত ধরণে খোকা এমনি কান্না আরম্ভ করিয়া দিল যে, তাহাকে শান্ত করিবার জন্য দোলা দিয়া, চাপড়াইয়া, কখনো বসাইয়া, কখনো দাঁড় করাইয়া—নানা উপায়েও অমিয়া তাহাকে চুপ করাইতে পারিল না। সে কখনো কোনো ছোট ছেলেকে এমন ভাবে কাছে ডাকে নাই, বশীভূত করিতে পারে নাই, চাহেও নাই। ছেলেদের মন ভুলাইবার মন্ত্র ছড়া বা গান এ সব কখনও অনুশীলন করে নাই; করাটাকে সে বরাবর পাগলের কাণ্ড বলিয়াই মনে করিয়া আসিয়াছে। তাহার ন্যায় বিবাহ-

নিবারিণী সভার সভ্যের কাছে অবশ্য এটা পাইবার আশা করাও কিছু উচিত নয়। কিন্তু ছোট ছেলেরা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে আইন আদালতের বাহিরে। তাহারা উচিত অনুচিতের বোধ রাখে না—নিজেদের পাওনা সর্ব্বত্র পুরামাত্রায় আদায় করিয়া লইতে চায়। আজ এই ক্ষুদ্র শিশুটি অমিয়াকে বিলক্ষণরূপেই ইহা বুঝাইয়া দিতেছিল যে, প্রয়োজন না থাকিলেও অনেক বিস্তার অনুশীলন করিয়া রাখিতে হয়। আর এই অভিজ্ঞতার ত্রুটি সংশোধনে অমিয়া ইংরাজী বাঙ্গালা হিন্দীতে যা খুসী শব্দ ব্যবহার করিয়া, সুর করিয়া তাহাকে যা কিছু বলিতেছিল, তাহার কোন অর্থ ছিল না। সে বিরক্ত হইয়া যখন বলিতেছিল—"খোকা—তুমি থামো—থামো—থামো,—আমি ঘুমপাড়ানি গান জানি না—জানি না—জানি না,—তুমি আমায় দয়া করে থাম"—তখন হয় ত তাহার মনের ভুল নয় ত সত্যও হইতে পারে—খোকা তাহার সেই সুরকরা কথার আওয়াজে এবং দোলা দেওয়ার ভাবে কান্নার বেগ কমাইয়া আনিয়াছিল। দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া সে উহারই পুনরাবৃত্তি সুরু করিল। "ঘুমপাড়ানির গান তোমার ভাল লাগে না—খুব বিশ্রী, খুব খারাপ— পিন্‌ফোটার মত লাগে!—কেমন খোকা, কেমন

খোকা!” কথাগুলি গানের সুরে উচ্চারিত হওয়ায়—বিরক্তি ক্রোধ ও ঘৃণায় তাহার কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া উঠিলেও খোকার তাহাতে কোন আপত্তি দেখা গেল না। সে তাহার কান্নামাখা চোখ দু’টিতে অমিয়ার বিরক্ত মুখের পানে আড়ে আড়ে চাহিয়া, পায়ের দোলা দিয়া ঐ গানের সুরই যেন বার বার শুনিতে চাহিতেছিল। “তোমরা তাহ’লে মা’দের কাছে কেবল এই চাও—ঘুমপাড়ানি ঘুমপাড়ানি পিসি মাসি, ঘুম-ঘুম—পাজী ছেলে, দুষ্টু ছেলে, বদ্‌মাস ছুঁচো, আমায় দিয়ে তোমার এই করানো? এখন থেকেই রাজাগিরি, এখন থেকে জোর খাটান!”

এতক্ষণে খোকার মুখে হাসি ফুটিল। তাহারই জয় হইয়াছে। সে ধীরে ধীরে অমিয়ার বাদামী শিল্কের ব্লাউজের কলারে, তাহার সৌখীন মান্দ্রাজী শাড়ীতে ময়লা চট্‌চটে বাতাসামাখা আঙ্গুলের ছাপ লাগাইয়া, একরাশ লালা ফেলিয়া, তাহার মাথার চুল ধরিয়া কাণ ধরিয়া টানাটানি করিয়া, সে যে গান শুনিয়া তুষ্ট হইয়াছে, তাহারই পুরস্কারস্বরূপ অনিচ্ছুক অমিয়ার নাসিকা ভক্ষণে এইবার উদ্যোগী হইল।

একখানি ফুলকাটা কাঁসার রেকাবীতে কতকগুলি ক্ষীরের লাড়ু, দু’খানি বাতাসা, খানিকটা দুধের সর, ও

একবাটি গরম দুধ লইয়া খোকার মা হাসিমুখে ঘরে ঢুকিয়া এই অদ্ভুত দৃশ্যে কিছুক্ষণের জন্য অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। খানিক পরে হাতের রেকাবী খানি ও দুধের বাটী মাটীতে নামাইয়া রাখিয়া, অমিয়ার ক্রোড় হইতে ছেলেকে তুলিয়া লইয়া কহিলেন—"এখন এই একটু কিছু মুখে দিন্, আমি উনুনে কাট দিয়ে এসেচি—সকাল সকাল খাবার ক'রে দেব আপনার। দোরের কাছে জল আছে, মুখ ধোবেন ত ধুয়ে নিন্। মা গো, ছেলেটা কি দস্যি! আপনার ভাল কাপড় চোপড় সব নষ্ট করে দিয়েচে যে একেবারে—যা নোংরা!"

নিজকে অমিয়ার এতই ক্লান্ত মনে হইতেছিল যে, ছেলের জন্য মীনার ক্রটি স্বীকারের পরিবর্ত্তে সুভদ্র বিনয় প্রকাশে খোকার অপরাধের অপলাপ বা অন্য কিছু সৌজন্য রক্ষার কথাও সে কহিল না। কাল ভোরে উঠিয়াই যে সে চলিয়া যাইবে, ইচ্ছা হইলেও সে কথাও বলিল না। মুখে হাতে জল দিয়া অল্পস্বল্প কিছু খাইয়া লইয়াই শুইয়া পড়িল। সমস্তদিন ট্রেণে আসিবার পর এইবার সে যথার্থ বিশ্রাম পাইয়াছে। কাল যতক্ষণ পুনরায় ট্রেণে চড়িয়া না বসিতেছে, ততক্ষণের জন্য এই বিশ্রাম শয্যা আর ত্যাগ করিবে না। চায়ের অভাব খুবই অনুভূত হইতেছিল, কিন্তু থাক্—সে কথা আর এখানে কেন?

পরদিন সকালে যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, প্রথমেই ট্রেণের বাঁশীর সুর তাহার কাণে আসিয়া পৌঁছিল। এখানকার অন্যকার একমাত্র ট্রেণখানি যে বাহির হইয়া গেল—ইহা তাহারই সাঙ্কেতিক চিহ্ন। আজ আর কোন গাড়ী এখান হইতে রওনা হইবে না—সুতরাং ব্যস্ত হইবার প্রয়োজনও আর কিছু নাই। তখনও ভাল করিয়া চোখের ঘুম ছাড়িতে চাহিতেছিল না। ট্রেণের শব্দেও তাহার মনে কোন চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল না—থাক্, যখন আসিয়া পড়িয়াছেই, তখন দু'এক দিন না হয় এখানেই একটু জিরাইয়া লইল!

পাখীর গান ও তাহাদের কিচ্‌কিচ্‌-কথার সুর তাহার কাণে ভাসিয়া আসিতেছিল। বিছানায় শুইয়াই সে তাহার ক্লান্ত চোখের ঘুম ছাড়াইয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল। খোলা জানালা দিয়া আকাশের বর্ণ দেখা যাইতেছে। কি আশ্চর্য্য মনোমুগ্ধকর নীল রঙ। ধোঁয়া বা কুয়াসার চাদর আচ্ছাদিত কলিকাতার পাংশু আকাশ নয়। তালগাছের পাতার আড়ালের ফাঁকে ফাঁকে অগ্নিচক্রের ন্যায় রাঙা আলোর স্রোত বহাইয়া সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে—ক্রমে আরও ঊর্দ্ধে উঠিতেছেন—কি চমৎকার দৃশ্য! বাহিরে বাগানে অজস্র ফুল ফুটিয়া সৌন্দর্য্যে গন্ধে মন ও চক্ষু

পরিতৃপ্ত করিয়া দিতেছিল। একটা দোয়েল এই কতক্ষণ গাছের ডালে বসিয়া শিশ্ দিতেছিল, এখনি উড়িয়া গিয়াছে।

অমিয়াকে বিনিদ্র বুঝিয়া, ছেলে কোলে মূর্ত্তিমতী হাসির ন্যায় মীনা আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। সকালবেলার স্নিগ্ধ রৌদ্রটুকু খোলাপথ দিয়া দুরন্ত ঘরের ছেলেটির ন্যায় ছুটাছুটি লাগাইয়া দিল। মীনার হাতে পাতাসুদ্ধ দুটি মস্তবড় হলুদ রঙের গোলাপফুল। ছেলের হাতে ফুলের গুচ্ছটি দিয়া মা হাসিমুখে কহিলেন—"খোকামণি, তোমার মাসীমাকে ফুল দাও ত ধন!" খোকা একবার অপ্রসন্ন অনিচ্ছুক দৃষ্টিতে অমিয়ার পানে চাহিয়া, মার মুখের দিকে চাহিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ঠোঁট্ ফুলাইয়া আপত্তি জানাইল। পুনরায় মার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। সেখানে সম্মতির কোন চিহ্ন না পাইয়া, ফুলগুলি অমিয়ার বিছানায় ফেলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে সুগোল হাত দু'খানিও অমিয়ার দিকে বাড়াইয়া দিল। তাহার সুন্দর মুখে সকাল বেলার স্নিগ্ধ রৌদ্রের আলোর ন্যায় হাসির আলো ফুটিয়া উঠিল। অমিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

খোকার বন্ধুত্ব

দিনের পর দিন যথানিয়মে চলিয়া যাইত। ফিরিয়া যাইবার একমাত্র ট্রেণখানি অমিয়াকে না লইয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যথানিয়মে ফিরিয়া যাইতেছিল। কেহ যদি এখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত যে সে ফিরিয়া গেল না কেন? নিশ্চয়ই সে তাহার কোন সদুত্তর দিতে পারিত না। যেদিন সে এখানে প্রথম আসে, সেদিন পথে আসিতে আসিতেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, পরদিন প্রাতেই এখান হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবে। আর যদিই তাহা না ঘটিয়া উঠে, তবে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মিস্ চৌধুরীকে একখানা কড়া করিয়া চিঠি লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিবে যে—কেন তিনি তাহার সহিত এভাবে শত্রুতা সাধন করিলেন? সে তাঁহার কি ক্ষতি করিয়াছিল যে সীতার বনবাসের পুনরাভিনয়ের প্রয়োজন ছিল তাঁর? কিন্তু পনেরো দিনের মধ্যে সে চিঠি লিখিবার জন্য অমিয়ার মনের কাছে কোন ত্বরা দেখা গেল না। অবসর মত যখন লিখিল, তখন অন্যান্য অবান্তর

কথার মাঝে বরং লিখিতে দেখা গেল—"রাজা হেরডকে তাঁর চিকিৎসক যে শুধু পাতা আর ঝরণার মধ্যে বিশ্রাম লইতে বলিয়াছিলেন, বাস্তবিক এও ঠিক সেই জায়গা। এখানে শ্যামলবক্ষ বসুমতী সুজলা সুফলা। পর্ব্বতের অনাবৃত উদার উন্নত মহামহিম ভাব-সৌন্দর্য্য মানবের ভাষাতীত। নদীর চঞ্চল ধ্বনি গীতি-মুখর। এখানে আমার সঙ্গী খরগোস্, হাঁস, ময়ূর, পাখী, হরিণ-শিশু আর এগারো মাসের নাদুস্ নুদুস্ হাসিমুখো একটি খোকা! সারাদিন আমার কোন কাজ নেই, কোন দায়িত্ব নেই, অর্থাৎ আমি কিছুই করি না, কেবল খাই আর ঘুমুই, আর মনে মনে বলি—'কাল হইতে আমি একজন কাজের লোক হইব'।"

ইহার উত্তরে মিস্ চৌধুরী তাহাকে চাঁচাছোলা ডাক্তারী ভাষায় একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়াছিলেন—"তোমায় আরো দু'মাস ওখানে থাকিতে হইবে। ওখানে ক'জনকে স্ত্রীস্বাধীনতা বা বিবাহ-বিরোধী মন্ত্রে দীক্ষিত করিলে?" চিঠি পড়িলে রাগ ধরে না? অমিয়া তাহার কার্য্যের শিথিলতা বেশ ভালই বুঝিতেছিল। নিশ্চয়ই সে কর্ত্তব্য-পালন করিতে পারে নাই, কিন্তু বুঝিয়াই বা সে করিবে কি? এখানে আছে কে, যাহাকে সে তাহার ন্যায্য অধিকার-লাভের পন্থা দেখাইয়া দিবে? মানুষের মধ্যে ত

একমাত্র মীনা। তা সে এক অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে! নিজের ঘরসংসারের কাজ, ছেলে আর স্বামী লইয়াই আনন্দে দিনরাত মস্‌গুল হইয়া আছে। কখনো ভাবেও না যে সে একজন ক্রীতদাসী—পদদলিতা বিবাহিতা নারী! ঝীটিও কি জুটিয়াছে তেমনি? স্বামী স্ত্রীতে দিনরাত খাটিয়া মরে, তাহাতেই যেন কত সুখী! মীনার স্বামী প্রাণতোষবাবু মানুষ অবশ্য মন্দ নহেন, দেখিতে শুনিতেও ভাল। কথাবার্ত্তা চাল চলনও সংযত স্নেহময়। সকল কাজে লোক দেখানো, মনভুলানো স্ত্রীর মতটি লওয়াও আছে। নিজেই যেন স্ত্রীর আজ্ঞাধীন—এমনি ভাব দেখাইয়া থাকেন,—কিন্তু ওসব ভূয়ো—সব ভূয়ো—আসল যা তাই। তিনি কাজের ছুতায় মধ্যে মধ্যে দূরে সহরে যান, দুই চারি-দিন কাটাইয়াও আসেন। সেখানে—সভা-সমিতি ক্লাব, সবই হয়ত আছে। বেচারী মীনা—আহা নিজের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তিও তাহার নাই!

তবুও অমিয়ার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও অজ্ঞাতে তাহার চিন্তার ধারা যেন ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। এই পদদলিতা নারী দু'টির অনাবিল অকৃত্রিম সুখে সহানুভূতিতে সে যেন নিজের অজ্ঞাতেই একটুখানি তৃপ্তি পাইতেছিল। বাড়ীর বাহিরে কাছাকাছির মধ্যে তেমন কেহ বড় নাই।

গোয়ালিনী যশীর মা, তাহার দুই যুবতী পুত্রবধূ আর কৃষাণ বধূ অনঙ্গ। ইহাদের শোচনীয় দুরবস্থার বিষয় ইহাদের বোধগম্য করান এতই কঠিন ও বিপদসঙ্কুল যে, একদিনেই তাহাদের অজ্ঞানতা-অন্ধকার নাশের সাধ অমিয়ার মিটিয়া গিয়াছিল। বধূদ্বয়ের সহিত তাহাকে কথা বলিতে দেখিয়াই শ্বাশুড়ী সভয়ে মীনার আশ্রয় লইয়াছিল—'মেম-দিদিমণি'র পরামর্শে তাহার শিশুবুদ্ধি বধূরা গির্জ্জায় গিয়া 'কৃষ্টান' হইয়া না বসে! গ্রামে এমন দুর্ঘটনা আরও একবার ঘটিয়াছিল। তাই অমিয়ার সাজসজ্জা, সকলের সহিত কথা বলা, একা যেখানে সেখানে বেড়াইতে যাওয়া এই সব অকাট্য প্রমাণ তাহাকে পল্লীনারীদের কাছে 'কৃষ্টান' আখ্যা দিয়াছিল। হিন্দু মেয়ের নাকি এত বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ হইতে বাকী থাকে?

এই সব নিরক্ষর বুদ্ধিহীনা মেয়েদের শিক্ষা দিয়া তাহাদের অবস্থার কথা বুঝান যে কত কঠিন, তাহা সে যেমন অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছিল, সেই সঙ্গে একটা নূতন চিন্তার ধারাও যেন তাহার মনের ভিতর দিয়া অলক্ষ্যে বহিয়া যাইতেছিল। বুঝাইয়া লাভই বা কি? শিক্ষা দিয়া,—সাহায্য দিয়া সে ত ইহাদের নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবে না। তবে মিছামিছি তাহাদের শান্তির সংসারে

অশান্তি অভাব জাগাইয়া দুঃখ আনিয়া দেয় কেন? থাক্ যে যেমন আছে, সবাই শান্তিতে থাক্! এ আনন্দপূর্ণ শান্তির রাজ্যে সহরের অভাব অভিযোগের হাহাকার টানিয়া আনিয়া কাজ নাই।

* * * *

শীত কমিয়া আসিলেও রোদের তাতটুকু এখনও বেশ মিষ্ট লাগিতেছিল। বাগানে দেবদারু ও শিউলি গাছে দড়ার 'দোলনা' টাঙ্গাইয়া, গায় মাথায় শাল ঢাকা দিয়া অমিয়া একখানি বই লইয়া সকালের দিকে প্রায়ই সেখানে শুইয়া থাকিত। কোন দিন বাগানে কোন দিন বা মটর সুঁটি সরিষা ও শাকের খেতের পাশ দিয়া মাঠে মাঠে খুব খানিক ঘুরিয়া আসিত; পাহাড় দূরে—ইচ্ছা থাকিলেও সঙ্গী অভাবে তাই যাইতে পারিত না।

আজকাল নীনার ক্ষেতের ফসল—গম, ধান, কড়াই, মটর, ছোলা প্রভৃতি সব ঘরে আসিতে সুরু হওয়ায় তাহার কাজ বাড়িয়া গিয়াছে। সেই সমস্ত ঝাড়ান বাছান, যথা-স্থানে তুলাইয়া রাখা, এই সব কাজেই তাহার সময় কুলাইয়া উঠে না। তাই খোকাকে অনেক সময় সে অমিয়ার কাছে রাখিয়া যায়। প্রথম প্রথম সম্পূর্ণ ইচ্ছা না থাকিলেও দায় পড়িয়া অমিয়া খোকার তত্ত্বাবধানের ভার লইত,—কিন্তু

এই দায়ে পড়ার ভাবটা কখন হইতে যে তাহার ভার না লাগিয়া হাল্‌কা হইয়া গিয়াছিল, তাহা সে বুঝিতেও পারে নাই। যেদিন সকাল বেলা খোকা দুধ খাইয়া তাহার কাছে না আসিয়া বাপের কাছে থাকিত, সেদিনকার সকাল বেলার সমস্ত মাধুর্য্যটুকুই অমিয়ার চোখে অঙ্গহীন হইয়া যাইত। সময় যেন কাটিতেই চাহিত না।

মীনার শিক্ষানুসারে খোকা এখন তাহাকে 'মাচিম্‌মা' বলিতে সুরু করিয়াছে। অমিয়ার মনে হয়, বাংলা ভাষার সবটুকু মধুর রস নিঙ্গড়াইয়া বাহির করিয়া বুঝি ঐ শব্দটি রচিত হইয়াছিল। ঐ মাসীমা শব্দটি মনে করিতে গেলেই মনে পড়ে, উপরে তাহার নিজের মাসীমা, আর নীচে হাস্য-প্রফুল্লমুখ অর্দ্ধস্ফুটবাক্ আনন্দনির্ঝর এই খোকা। বাগানে আসিবার সময় প্রায়ই সে একখানি ইব্‌সেন হাতে করিয়া আসিত, ইচ্ছা থাকিত বইখানি পড়ে, কিন্তু একজন স্ত্রী-লোকের পক্ষে—তা সে যতই কেন মানসিক ক্ষমতাশালিনী হউক না—এক সঙ্গে, একটি কলহাস্য মুখর এগারো মাসের দুরন্ত খোকা ও ইব্‌সেন দুইয়ের প্রতি মনোযোগিনী হওয়া বোধ করি সম্ভবপর হয় না। খোকা যতক্ষণ জাগিয়া থাকিত, বেচারা ইব্‌সেনকে ততক্ষণ প্রায়ই একটা ফ্যাঁকড়া বাহির-করা পেয়ারা গাছের কোটরের মধ্যে আশ্রয়গ্রহণ

করিতে হইত। খোকার জন্য সহর হইতে সে কতকগুলি খেলনা আনাইয়াছিল। অনেক সময় বাগানে ঘাসের উপর বসিয়া তাহারা বল লইয়া খেলা করিত। অমিয়া বল কুড়াইয়া আনিত, খোকা ছুঁড়িয়া গড়াইয়া দিয়া করতালি দিয়া হাসিত—কখন বা হামা দিয়া সে কুড়াইয়া আনিয়া দিত, অমিয়া গড়াইত, এমনি করিয়া দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্নরুচি অসমবয়সীর মধ্যে অত্যন্ত প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়া গেল। খোকার একটু অসুখ করিলে এখন মীনার চেয়ে তাহাকেই অধিক ব্যস্ত ও চিন্তিত হইতে দেখা যায়। তাহার স্নানাহারের সময় সম্বন্ধেও অমিয়ার দৃষ্টি অধিক সজাগ।

খোকা কোন নূতন ভাষা বা খেলার অনুকরণ করিলে, অমিয়ার মুখেই আগে বিস্ময়ানন্দের হাসি ফুটিয়া উঠে। খোকাকে স্নান করান খাওয়ানর সম্বন্ধে এখনও তাহার হাত না থাকিলেও সে সময় প্রায়ই সে কাছে বসিয়া দেখিত। কোন দিন কাযের মধ্যে মীনা একসময় হয়ত বাহিরে বাগানে আসিয়া দেখিত, অমিয়ার দামী শালের বেষ্টনে তাহার কোলের কাছে দোলার ভিতর খোকার একরাশ কোঁকড়াচুলে ঢাকা প্রসন্ন ঘুমন্ত মুখখানি বাহির হইয়া আছে। দু'জনেই তাহারা আরামে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের মাথার চুলে, গায়ের শালের উপর, শেফালি-

ফুল ঝরিয়া যেন পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছে। মীনা মুগ্ধ হইয়া সেই বনদেবী-মূর্ত্তির পানে চাহিয়া থাকিত। সেই সঙ্গে একটা নূতন সাধও তাহার মনে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিত। আহা তা যদি হয়, বেশ-হয়। স্বামীর কাছে এ প্রসঙ্গ তুলিয়া কোন ফল হয় নাই; তিনি তাহার আশাতরু অঙ্কুরেই তুলিয়া ফেলিতে উপদেশ দিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন,—"তুমি ত জান না, পুরুষকে উনি কত ঘৃণা করেন। জান্‌লে—একথা বল্‌তে পার্‌তে না।" তাই সে মনের ভিতরের গোপন আশাটিকে আর বাড়িতে দিতে সাহস করে নাই। তবু সেদিন মনে মনে সে প্রার্থনাও করিয়াছিল—ভগবান যেন একদিন এই দর্পিতা নারীর দর্পচূর্ণ করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, দাসীত্ব নারীর জীবনের চরম দুঃখ নহে—তাহার প্রার্থিতও বটে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নবাগত

ধোবা অনেক দিন কাপড় দিয়া যায় নাই। অনেকগুলি ময়লা-কাপড় খাটের নীচে পুটুলি বাঁধা পড়িয়া আছে। পরণের শাড়ী জ্যাকেটগুলিও ময়লা হইয়া আসিয়াছে। সকালবেলা অত্যন্ত অপ্রসন্নচিত্তে ধোবার তাগিদের জন্য অমিয়া মীনার খোঁজে গিয়া দেখিল, সে তখন বাগানের অপর অংশের অব্যবহার্য্য ঘরগুলির প্রসাধনে ব্যাপৃত। একগাছি লাঠির মাথায় ঝাঁটা বাঁধিয়া, টুলের উপর দাঁড়াইয়া, নাকে মুখে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধূলা মাখিয়া ও উড়াইয়া, মাথার চুলে একরাশ ঝুল লাগাইয়া ঘর ঝাড়ার কাজ শেষ করিয়া এইবার সে ফুলগাছের টবগুলি কোথায় কি ভাবে সাজাইলে বাহার খুলিবে, তাহাই পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল। অমিয়াকে ঘরে ঢুকিতে উদ্যত দেখিয়া হাসিয়া হাত নাড়িয়া নিবারণ করিয়া কহিল—"এস না, এস না ভাই, দেখ্‌চ না কি রকম ধূলো উড়চে। কাপড় মাথা সব ময়লা হ'য়ে যাবে।"

অমিয়া অপ্রসন্ন-হাস্যে কহিল—“সবই ত সাফ্ আছে, তার ময়লা হবার ভয়! কিন্তু সকালবেলা তোমার এ কি খেলা হ'চ্চে শুনি। উত্তম কোথা গেল, তাকে ডাক্‌লেও ত হ'ত?”

ফুলের টবগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া, টেবিল চেয়ার গুলি কোথায় কি ভাবে রাখিলে মানাইবে মীনা মনে মনে তাহারই একটা খস্‌ড়া করিতেছিল; অমিয়ার কথায় মুখ না ফিরাইয়াই কহিল—“উত্তম এখন ত গরু দেখ্‌চে। জাব দেবে, জল তুল্‌বে, সে ত এখন আর ছুটি পাবে না ভাই! ঠাকুরপো কখন এসে পড়্‌বেন, তার আগে ঘরটরগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে রাখ্‌তে হবে। একেই ত মেয়েদের নিন্দে করতে পেলে তাঁর চতুর্ম্মুখ হয়। তাঁর বিশ্বাস, আহার নিদ্রা পরচর্চ্চা ছাড়া আমাদের মেয়ে-জাতটার আর কোন কাজ নেই।”

মীনা ঝাড়ন দিয়া টেবিল চেয়ারের ধূলা ঝাড়িতে আরম্ভ করায় অমিয়া বিরক্তভাবে কহিল—“মেয়েরা যদি এত নির্গুণ তবে ওঁদের সংসার চালায় কে? বিনা মাইনের কেনা দাসী পেয়েচেন বলেই না এত বাবুগিরি! নিজেদের সুবিধের জন্যে মেয়েদের এমন করে চেপে না রাখ্‌লে কে ওঁদের রেঁধে ভাত দিত, ছেলের ধাই হ'ত, জুতোর

ফিতে চাপকানের বোতাম খুল্‌ত, রাত জেগে ওঁদের আর ওঁদের ছেলেপুলেদের সেবা কর্‌তো, ওষুধ দিত, হেঁটে এলে পায়ে তেল মালিস্‌ কর্‌ত শুনি ? সত্যি বল্‌চি মীনা, তোমাদের নিজেদের দোষেই তোমাদের এত দুর্গতি।"

অমিয়া হঠাৎ স্বর নামাইয়া একটু হাসির সহিত কহিল—প্রাণতোষবাবুর সম্বন্ধে আমি কিছু বল্‌চি না। তাঁকে অবশ্য আমি শ্রদ্ধা করি—আমি বল্‌চি সাধারণ পুরুষ-সমাজকে। সহ্য ক'রে, দাসীপণা করে ওঁদের তোমরা মাথায় তুলেচ বলেই না ওঁদের এত সাহস বেড়েচে—যে যার নোড়া তারই দাঁত ভাঙ্গতে চান! মেয়েরা একবার প্রতিজ্ঞা ক'রে সব কুমারী থাকুক্‌ দেখি—কেমন না ওঁদের বিষদাঁত ভাঙ্গে? দিনকতক নিজে নিজে চালান না সংসার, দেখুন না তা'তে কত সুখ! আর আমরাও বুঝিয়ে দেবো যে, পুরুষের দাসীত্বই আমাদের একমাত্র কাম্য নয়। আমরাও মানুষ—মানুষের অবশ্যপ্রাপ্য অধিকার লাভের ইচ্ছা ও শক্তি আমাদেরও আছে। আর, ন্যায়সঙ্গত বলে একদিন তা আমরা অধিকারও কর্‌ব।"

মীনা ঝাড়নখানা দেওয়ালের একটা হুকে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া একটুখানি মিষ্ট হাসিয়া কহিল—"কে জানে ভাই, ঠাকুরপো ত বলেন আমরাই ওঁদের সংসার-যাত্রার পথে

বিরাট্ বাধা। ভাগ্যে তাঁদের ইঞ্জিনের জোর বেশী, তাই এই গাধাবোটগুলোকে কোন মতে ওঁরা টেনে নিয়ে যেতে পারেন। নইলে নিজেদের জোরে চলাফেরা করারও নাকি আমাদের শক্তি নেই। তিনি ত বিয়ে কর্‌বেন না বলেই প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে আছেন। এতেই বোঝ না, মেয়েদের উপর তাঁর কেমন ভক্তি।"

এই নূতন লোকটির আগমন-সম্ভাবনা অমিয়ার মনে এতক্ষণ যে অস্বস্তির ছায়া ফেলিয়াছিল, তাহার মতের পরিচয় লাভে সে বিরক্তির ভাবটুকু যেন সরিয়া গিয়া বেশ একটু কৌতুকপূর্ণ আগ্রহের ভাব জাগিয়া উঠিল। এই নারীদ্বেষী লোকটিকে তবে ত ভাল করিয়া একবার দেখা উচিত!

চিন্তাপূর্ণ-চিত্তে অমিয়া মাঠে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। আজ আর হব্‌সেন বা খোকা কাহারও তত্ত্ব লইতে তাহার মনে পড়িল না। মনের সবখানটাই তখন সেই অদৃষ্ট অভ্যাগতের চিন্তায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এই নূতন লোকটিকে সে কি ভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে, ইহাই যেন তাহার মনের এক মাত্র সমস্যা হইয়া উঠিয়াছিল।

লোকটার চিন্তা মনে উঠিতে প্রথমেই তাহার মনে হইল—তাঁহার চেহারা কেমন? মনে হইল—মোটাসোটা, শ্যামবর্ণ, দাড়ীগোঁফ-কামান, মাথার চুল খুব ছোট করিয়া

ছাঁটা, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, চুলের সঙ্গে চিরুণীর সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন হয় না। পরণে সাদা ধুতি, গরদের কোট, বেশ একটুখানি মুরুব্বি-আনাভাবের কথাবার্ত্তা, একটু দাম্ভিক ভাব!

অমিয়া স্থির করিল, এই অপ্রিয় লোকটিকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া এড়াইয়াই চলিবে। নারীকে যে ঘৃণা করে, নারীও তাহাকে ঘৃণা করিতে জানে। কিন্তু সব সমস্যার সমাধান করিয়া এইবার বোধ হয় তাহার বাড়ী ফেরাই উচিত হইতেছে। নিজের পরিপুষ্ট বাহুখানির পানে চাহিয়া একটুখানি সলজ্জ হাসির রেখা তাহার আরক্ত অধরপুটে ফুটিয়া উঠিল। মনে হইল ইহার পর শরীর সারান কোন শিক্ষিতা মহিলার পক্ষেই সঙ্গত হইবে না! এখানের জলবাতাসের গুণে সে যেমন সারিয়াছে তেমনি ময়লাও হইয়াছে, কাপড়-চোপড়ের অবস্থাও তাই। এখন তাহার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবেরা তাহাকে দেখিলে, সেই তন্বী গৌরী শোভনা সুন্দরীর এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে একেবারে অবাক্ হইয়া যাইতেন—মনে করিতে মনে মনে সে খুসী না হইয়া লজ্জানুভব করিতেছিল।

রোদের তাপ মাথা ও মুখে কষ্টকর হইয়া বুঝাইয়া দিল, এইবার গৃহে ফেরা একান্তই আবশ্যক। সেই সঙ্গে

চিন্তার ধারা পরিবর্ত্তিত হওয়ায় প্রথমেই মনে হইল, মীনা এতক্ষণ তাহার চায়ের বাটী হাতে তাহারই প্রতীক্ষায় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। আজ কোথায় মীনার একটুখানি সাহায্য করিয়া তাহার কোন কাজে লাগিবে, তা না হইয়া নিজের কাজেই তাহাকে জোড়া করিয়া রাখিয়াছে। মাসীমা তাহাকে সংসারে কোন কাজে না লাগাইয়া এমনি অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিয়াছেন যে, কাজের প্রয়োজন কখন ও কোথায় তাহা সে অনুভব করিতেও পারে না।

ফিরিবার সময় নবাগতের দৃষ্টি এড়াইবার ইচ্ছায় ঘুরিয়া সে পিছনের দরজা দিয়া বাড়ী ঢুকিল। যেদিন প্রথম সে এখানে আসে, এই পথ দিয়াই বাড়ী ঢুকিয়াছিল! আজও গেটের দুই পাশে দুইটা প্রকাণ্ড গাই তাহাদের বাঁকা শিং লইয়া দুর্গ-রক্ষকের ন্যায় সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছে। বাধা পাইয়া মুহূর্ত্তের জন্য সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কিন্তু আজ আর সেদিনের ন্যায় নিজকে তাহার বিপন্ন বলিয়া মনে হইল না। দৃষ্টান্ত ও অভিজ্ঞতা তাহাকে সাহসী করিয়াছে।

মীনার অনুকরণে সাহস করিয়া সে গরু দুটির গায়ে ধীরে ধীরে হাত দিয়া ঠেলা দিতেই তাহারা পথ ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। স্নেহপালিত প্রকাণ্ড পাহাড়ী-গাই

দু'টি নিরীহ মার্জ্জার-শিশুর ন্যায় যেন অমিয়ার আদর প্রত্যাশায় মাথা দিয়া তাহার গাত্র স্পর্শ করিয়া আদর জানাইল। তাহাদের স্বচ্ছ বৃহৎ চক্ষুর পানে চাহিয়া চাহিয়া অমিয়ার মনে হইতেছিল, সে দৃষ্টি যেন বলিতেছিল, বাহির দেখিয়া অন্তরের বিচার করিও না—প্রকাণ্ড শরীরের মধ্যেও অত্যন্ত নিরীহ প্রাণ বাস করিতে পারে'।

বাড়ী ঢুকিতেই বিলম্বের জন্য মীনার নিকট মৃদু স্নেহ-তিরস্কারের সহিত খবর পাইল, রণেন্দ্রবাবু যথাসময়ে আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন, এবং এই কতক্ষণ তিনি স্নানার্থে নদীতীরে গিয়াছেন। খোকাবাবু উত্তমের কোলে চাপিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। এবং ধোবা আসিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া আছে। এবেলার মত নবাগতের সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা চুকিয়া যাওয়ায় অমিয়া মনে মনে খুসী হইয়া, জলযোগ করিয়া খাতা পেন্‌সিল লইয়া কাপড় মিলাইতে বসিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মাসীমার চিঠি

বাগানের অপর অংশে পাশাপাশি তিনখানি ঘর। এ ঘরগুলি বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কখনো ব্যবহৃত হয় না। নির্জ্জনতা-প্রিয় রণেন্দ্রের সুবিধা বুঝিয়া মীনা এই ঘরগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া তাহার ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিল। সাম্‌নের বড় ঘরখানি টেবিল চেয়ার দিয়া বসিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, পাশের ছোট দুইখানি শয়নের ও পরিচ্ছদাদি রাখিবার জন্য যথাযোগ্যভাবে সাজান হইয়াছিল। ইহাতে রণেন্দ্রর সুবিধা হইলেও, অমিয়ার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ঘটিল। ঘরের সম্মুখেই বাগান, এই বাগানে খোকার সহিত খেলা করিয়া, গাছে-টাঙ্গান দড়ির দোলায় শুইয়া বই পড়িয়া, কত সময় অকারণ ঘুরিয়া বেড়াইয়া তাহার দিবসের তৃতীয়াংশ কাল আনন্দেই কাটিয়া গিয়াছে; ইহাকে বাদ দিতে হইলে এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়-অংশটুকুই তাহার বাদ পড়িয়া যায়। রণেন্দ্রের

বসিবার ঘরের যে বড় জানালা দু'টি বাগানের দিকে মুখ রাখিয়া তাহাদের বক্ষ-কবাট মুক্ত রাখিতে বাধ্য হয়, আর সেই মুক্ত দ্বারপথে সময় সময় যে নারীদ্বেষী যুবকের বিরক্ত দৃষ্টি অনিচ্ছাতেও এদিকে পতিত হয়, তাহার লক্ষ্য হইতে কোন নারীরই বোধ করি কখন প্রবৃত্তি থাকে না? প্রথম যেদিন অমিয়ার আবির্ভাবে খোলা জানালাটি তাহাকে সচকিত করিয়া সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল, সেদিন অপ্রিয় দৃষ্টির বিষয়ীভূত না হওয়ার আনন্দলাভের পরিবর্ত্তে কেনই যে অপমানের তীব্র ব্যথায় অমিয়ার সারা চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল, তাহা সেও বলিতে পারিত না।

পর্দ্দা না রাখিয়া একবাড়ীতে বাস করিতে হইলে বাড়ীর সব কয়টি লোকের সঙ্গে চোখোচোখি হইয়াই থাকে। খোকার উপলক্ষে রণেন্দ্রের সহিত দু'চারটি কথাও সে কহিয়াছে। এই লোকটির সম্বন্ধে সে যে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, বাস্তবের সহিত তাহার কোন মিল দেখা না যাওয়ায় নিজের ভুল-ধারণার জন্য সে যেন মনে মনে একটু খানি লজ্জিতই হইয়াছিল। লোকটিকে দেখিয়া চক্ষুপীড়া-উৎপাদক বলিয়া তাহার মনে হয় নাই। তাহার হাবভাব চালচলন কথা কহিবার পদ্ধতি—সবই সংযত সুভদ্র বলিয়াই সে মানিয়া লইয়াছিল। তবু মীনার সহিত কথা কহিবার

সময় তাঁহার মনের বিষ সময় সময় এমন তীব্র ও তীক্ষ্ণ মন্তব্যরূপে ঠোঁটের বাহিরে আসিয়া পড়িত, যাহা কোন নারীর পক্ষেই বীণাধ্বনিবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে না—অন্ততঃ অমিয়ার ত হয় নাই।

পুরুষের প্রতি স্বাভাবিক তাচ্ছিল্যে সে কখনও কোন পুরুষের স্তুতি-নিন্দার প্রতি লক্ষ্য রাখে নাই সত্য, কে তাহাকে কি ভাবে দেখিতেছে ইহা জানিবার ইচ্ছা বা আগ্রহও তাহার কোনদিন জন্মে নাই। কিন্তু সে যে সুন্দরী, এ খবর তাহার নিজের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। সৌন্দর্য্যের পূজা পাইবার যে স্বাভাবিক ইচ্ছা বা দাবী এতদিন তাহার মনের নিভৃত প্রদেশে গোপনে লুকাইয়াছিল, তাহাকে প্রশ্রয় না দিলেও, আশ্রয় দিতে সে অনিচ্ছুক ছিল না। সখী-সঙ্গিনীদের মুখে নিজ রূপের প্রশংসা সে চিরদিনই শুনিয়া আসিতেছে—এ স্তুতি সে তাহার অবশ্য-প্রাপ্য হিসাবে অবহেলাতেই গ্রহণ করিয়া থাকে। তাই রণেন্দ্রের এই তীব্র তাচ্ছীল্য তাহাকে শুধু অপমানিত নয়, পীড়িতও করিল। মনে হইল, সে কি এতই কুরূপা যে চোখে দেখাও সহ্য যায় না? এমন তীব্র বিদ্বেষ সেও ত কৈ কোন সম্প্রদায়-বিশেষের প্রতি পোষণ করে না! অভিমানে আঘাত লাগায় নিজকে সে ভুল বুঝাইল। রণেন্দ্র

যদি ঠিক্ এমন ব্যবহার না করিয়া অন্য কোনরূপ কিছু করিত, তবে সেই হয়ত তাহাকে অভদ্র আখ্যানে আখ্যাত করিতে ছাড়িত না। অন্যায় যে কোথায় তাহা ধরা পড়িতেছিল না বলিয়াই বিরক্তি বাড়িতেছিল। মনে হইতেছিল, এই লোকটিকে হার মানানই যেন তাহার এখনকার অবশ্য কর্ত্তব্য।

নারী যে সত্যই ঘৃণা বা অবজ্ঞার পাত্রী নহে, ঐ রণেন্দ্রই একদিন স্বেচ্ছায় ইহা স্বীকার করিবে—তবে তাহার অপমানের শোধ যাইবে। কিন্তু ঐ লোকটির ঘৃণা বা প্রশংসালাভে তাহার যে কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইতে পারে, এইটুকুই কেবল তাহার মনে পড়িতেছিল না।

আজকাল রণেন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া চলা, তাহার সম্বন্ধে নিজকে সম্পূর্ণ অনাসক্ত উদাসীন দেখান—ইহাই যেন তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। সারাদিন নানা উপায়ে নানা ছন্দে সে কেবল তাহাকে আঘাত দিতেই ভালবাসিত। কিন্তু আঘাত ঠিক্ লক্ষ্য স্থলে পৌছাইতেছে কি না, সময় সময় মনে এমন সন্দেহও জাগিত। রণেন্দ্রের তীব্র ঔদাস্যের বর্ম্মে ঠেকিয়া অনেক সময় তাহার তাচ্ছীল্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তীরগুলি ফিরিয়া তাহারই বক্ষে আসিয়া বিঁধিত।

বাড়ী যাইবার জন্য মনের কাছেও সে ত্বরা অনুভব করিতেছিল। খোকাও তাহার নিকট হইতে ক্রমে দূরে চলিয়া যাইতেছে, তবে আর এখানে তাহার কিসের প্রয়োজন? আজকাল করিয়া মীনা কিন্তু নিত্যই তাহার যাত্রার দিন পিছাইয়া দিতেছিল। এমন সময় সত্যবতীর একখানা পত্র আসায় কিছুদিনের মতই অমিয়াকে বাধ্য হইয়া বাড়ী ফিরিবার সংকল্প ত্যাগ করিতে হইল। সত্যবতী লিখিয়াছেন, তাঁহার এক বাল্যসখীর সঙ্গ-সুযোগে তিনি একবার কাশী যাইতেছেন, ইচ্ছা আছে আরও কোথাও কোথাও ঘুরিয়া আসেন। ফিরিতে মাসখানেক বিলম্ব হওয়াই সম্ভব। অমিয়া যেন এখন বাড়ী না ফিরে ইহাই তাঁহার আদেশ, কারণ তাহাকে একা ফেলিয়া তিনি ত কোথাও যাইতে পারিবেন না।

চিঠি পড়িয়া মনঃক্ষুন্ন হওয়ায় অমিয়ার প্রথমটায় মাসীমার উপর অভিমান হইল, পরে ভাবিয়া দেখিল এ রাগ করা তাহার অন্যায়। পিতৃপরিত্যক্তা এই জঞ্জালকে কণ্ঠহার করিয়াই যে মাসীমা তাঁহার ইহ পরকাল সবই ত্যাগ করিয়াছেন! শুধু তাহার সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগ মিটানই তাঁহার জীবনের জপমালা হইয়া উঠিয়াছে। আজ যদি কোনরূপে বাহিরে যাইবার সুযোগ তাঁহার মিলিয়াছে,

তবে নিতান্ত স্বার্থপরের মত তাহাতে প্রতিবন্ধক হওয়া তাহার অনুচিত হইবে। সে সঙ্গী হইলে তাঁহার ইচ্ছামত যেখানে সেখানে বেড়ান বা থাকার অসুবিধা ঘটিতে পারে। তা ছাড়া হয় ত এই সুযোগে মাসীমার চিরদিনের রুগ্ন দেহ কিছু সারিতেও পারে। সে কেবল নিজের সুবিধার দিকটাই দেখিতে শিখিয়াছে, তাঁহার সুখ-দুঃখ আরাম-বিরামের কথা মনেই করে না।

পত্রোত্তরে মাসীমাকে সে লিখিয়া দিল,—তাঁহার ইচ্ছানুসারে সে এখন কিছুদিন এখানেই থাকিয়া যাইবে, কিন্তু এই থাকাটা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপরতা নহে, ইহার পরিবর্ত্তে মাসীমা যদি যথেষ্ট শারীরিক উন্নতি করিয়া না আসিতে পারেন, তবে সে ভারী অনর্থ বাধাইবে।

খবর শুনিয়া মীনা আনন্দে অমিয়াকে জড়াইয়া হাসিয়া কহিল—"বেশ হল ভাই। আমার এমন আহ্লাদ হচ্চে তা কি বল্‌ব! তুমি চলে যাবে এখন আমার মনে কর্‌তেও যেন ভয় হয়।"

অমিয়া খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া হাসিয়া কহিল—"সত্যি বল্‌চ মীনা, আমি চলে গেলেও আমায় মনে রাখ্‌বে? খোকামণি, তুমি কিন্তু আমায় ভুলে যাবে—এ আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি। তোমাদের জাতটা

আলাদা কিনা ?” বলিয়া সস্নেহে তাহাকে চুম্বন করিল। সে “কাকা কাকা” বলিয়া বন্ধনমুক্তির আশায় হাত পা ছুড়িতে আরম্ভ করায়—“নিমকহারামটার কাণ্ড দেখেচ” বলিয়া অমিয়া তাহাকে মাটিতে নামাইয়া দিল। ছাড়ান পাইয়া হামা দিয়া একটু দূরে সরিয়া গিয়া, সে একটা ভূপতিত বোতাম কুড়াইয়া লইয়া মুখে পূরিয়া, যেন মস্ত একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, এমনি ভাবে হাসিতে লাগিল।

অমিয়া মীনার পানে চাহিয়া বিদ্রূপের স্বরে কহিল—“ছেলেটিকে যে একেবারে নিঃস্বত্ব হ’য়ে দান করেচ, একবার চোখের দেখাও দেখ্‌বার উপায় নেই—গরীব বেচারী আমার উপর এ জুলুম কেন বল দেখি ? ওকে বাদ দিলে তোমার এখানে এমন কি আছে বল দেখি, যার লোভে থাকা যায় ?”

“তাই নাকি ? মন ভোলাবার মন্ত্র বুঝি কেবল খোকাই শিখেচে ?” বলিয়া মীনা মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তাহার হাসির তলে এমন একটি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুর ধ্বনিত হইল, যাহাতে কোন কারণ না থাকিলেও অমিয়ার মুখখানা অকারণে রাঙা হইয়া উঠিল। মীনার কথার জবাবে সে কেবল মৃদুস্বরে কহিল—“নিশ্চয় ! খোকার মার যে সে মন্ত্র জানা নেই, তা বোধ হয় তিনি নিজেই এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছেন।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অবিচার

দুপুর-বেলার অবসরে শোবার ঘরের মেঝের বিছানায় একখানি বই হাতে করিয়া মীনা শয়ন করিয়াছিল। বই-খানি মাসখানেক পূর্ব্বে সে অমিয়ার কাছে উপহার পাইয়াছে। সময় ও আগ্রহ অভাবে এ পর্য্যন্ত সেখানির পাতা খুলিয়া দেখা হয় নাই। কার্য্যাভাবে আজ পড়িবার জন্য হাতে লইয়াছিল এবং কোনও এক সময় পড়াতেও মন লাগিয়াছিল। সাড়া দিয়া রণেন্দ্র দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মীনা চাহিয়া দেখিল, খোকা তাহার কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

"এস না ঠাকুরপো, দাঁড়ালে কেন? ওকে ঐ খাটের বিছানায় শুইয়ে দাও না ভাই"—বলিয়া সে পুনরায় পাঠে মন দিল। খোকাকে সন্তর্পণে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া রণেন্দ্র খাটে বসিয়া হাসিয়া কহিল—"পড়া? কি আশ্চর্য্য! বিদ্বানদের হাওয়া লেগে আপনিও যে বিদ্বান হ'য়ে উঠ্‌লেন দেখ্‌ছি?"

মীনা বইখানির পাঠ্য-অংশটি চিহ্নিত করিবার জন্য সেই পৃষ্ঠাটির একটি কোণ মুড়িয়া রাখিয়া বইখানি পাশে রাখিয়া দিয়া হাসির সঙ্গে গাম্ভীর্য্য মাখাইয়া কহিল—"মিথ্যে অপবাদ দেবেন না বল্‌চি। জানেন, দুই ভাইয়ে পরীক্ষা নিয়ে তবে নিয়ে এয়েচেন!"

"তা সত্যি—চারুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ, পদ্যপাঠ, ভূগোলসার, সন্দর্ভহার, নীতিকথা, শিক্ষাসোপান, পদ্যসার, রয়েলরীডার, নবধারাপাত, কবিতাবলী—বাপ্, নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে! কোথাও ত কমা, সেমিকোলন, ড্যাস্, ফুলষ্টপের বালাই নেই। নামাবলীটা মুখস্ত করেছিলেন কিন্তু খাসা! একটা লাইব্রেরী উজোড় বই!"—বলিয়া রণেন্দ্র হাসিতে লাগিল।

মীনা মুখ ভার করিয়া কহিল—"শুধু নামই মুখস্থ করেছিলাম বৈকি। বইগুলো মুখস্থ কর্‌ত কে মশাই?—সে আপনাদের কলেজ নয় যে প্রক্সী দেবেন বা নোট পড়ে কায সার্‌বেন!—সে লোকনাথ পণ্ডিত মশায়ের কাছে পড়া, সেখানে ফাঁকি দিয়ে বিদ্যে হয় না গো!" বলিয়া গাম্ভীর্য্য ছাড়িয়া হাসিতে লাগিল।

রণেন্দ্র ততক্ষণ মীনার পরিত্যক্ত পুস্তকখানি তুলিয়া লইয়া পাতা উল্‌টাইয়া এখানে সেখানে চোখ বুলাইয়া দেখিতেছিল। বইখানির নাম—"নারীর বিদ্রোহ," লেখিকা—

"অমিয়া"। গ্রন্থকর্ত্রী একস্থানে তাঁহার মোহনিদ্রাচ্ছন্না ভগিনীগণকে জাগরিত হইবার জন্য আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—"এস আমরা সমবেত শক্তি মিলিত হইয়া আমাদের চিরদিনের দাসত্ব-শৃঙ্খল, আমাদের অধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করিয়া একবার বাহির হই। আমাদের প্রতি অবিচার-পরায়ণ হৃদয়হীন সুখবিলাসী পুরুষজাতিকে একবার দেখাইয়া দিই যে, দমনের যুগ আর নাই। এখন সাম্য—স্বাধীনতার দিন। আমাদের ন্যায্য অধিকার ফিরাইয়া পাইবার একমাত্র সরল ও সহজ পন্থা—চিরকৌমার্য্যব্রত গ্রহণ করা, সকল অবিবাহিতা ভগিনীগণকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করা। ভগিনীগণ! স্মরণ রাখিবেন, একতাই জাতীয়জীবন প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র, আত্মরক্ষার অমোঘ বর্ম্ম, শত্রু-দমনের বিজয়-অস্ত্র। এস আমরা একতা-বলে বলীয়ান্ হইয়া আমাদের প্রাপ্য দুর্গ দখল করি। স্বার্থ-সর্ব্বস্ব পুরুষ-জাতির স্বার্থের পথে বাধা জন্মাইতে, আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠায় সম-অধিকার লাভে, ক্রীতদাসীত্বের শৃঙ্খল চূর্ণ করিতে, মহাশক্তির অংশরূপে আত্মশক্তির প্রকাশ করিতে এবার যেন আমরা সত্য সত্যই সক্ষম হই—যাচকের দীনতা হীনতা লইয়া নয়, স্বাবলম্বন-মন্ত্রের দীক্ষা লইয়া। যাঁহারা জাতীয়-জীবনের নেত্রী, মানবশিশুর জননী, ধাত্রী, পালয়িত্রী,

শিক্ষাদাত্রী, তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়হীন প্রভু-সম্প্রদায়ের নিকট পাইয়াছেন কি? সন্তানকে দিবার মত তাঁহাদের আছেই বা কি? ভগিনীগণ—দাসীপুত্র দাসই হয়! দাসত্বের বীজ যাহাদের অস্থিমজ্জার সহিত সংক্রামক রোগের কীটাণুর ন্যায় মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের দাসত্ব ছাড়া আর কি থাকিতে পারে? কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে এত অবিচার চিরদিন চলিবে না! আঃ—কবে সেদিন আসিবে—কবে?"

এই পর্য্যন্ত পড়িয়া রণেন্দ্র বইখানি মুড়িয়া রাখিয়া বিদ্রূপপূর্ণ হাস্যের সহিত কহিল—"আমি বল্‌চি—'যেদিন আপনারা আরসুলা, ইঁদুর, টিকটিকি দেখিয়া ভয় পাইবেন না, আপনাদের ন্যায্য অধিকার সেইদিনই আপনারা ফিরাইয়া পাইবেন, তাহার একদিনও পূর্ব্বে নহে। আমি বলিব না যে ঘোড়া রাশ ছিঁড়িয়া লাফাইতে থাকিলে আপনাদিগকে তাহার মুখ ধরিয়া শান্ত করিতে হইবে, মুটে না মিলিলে দুই মণ বোঝা মাথায় তুলিতে হইবে, অথবা পালোয়ানের সহিত ঘুষাঘুষি'—"

মীনা তাহার বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া হাসিয়া লুটাইতে-ছিল। পাছে বেশী বাড়াবাড়ি হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে বাধা দিয়া কহিল—"থামুন মশায়, থামুন, আপনার আর

ব্যাখ্যায় দরকার নেই। আমরা নিজেরাই সে সব ভেবে নেব—আপনার সাহায্য চাইবও না।”

“ভদ্রে, আপনার সাহস প্রশংসনীয়। কিন্তু আমার মনে হচ্চে, আজই যেন দাদার বইয়ের আলমারীটা সরিয়ে দেবার জন্যে অভাগা পুরুষমানুষদেরই সাহায্য করবার কথা ছিল। কিন্তু এখন দেখ্‌চি তার আর বোধ হয় দরকার হবে না, সেটা আপনাদের আত্মশক্তিতেই কুলিয়ে যাবে”—বলিয়া রণেন্দ্র পুনরায় হাসিয়া কহিল—“এই সব জ্যাঠামো-গুলো দেখ্‌লে আমার কিন্তু ভারি বিরক্তি ধরে। পুরুষ-জ্যাঠা বরং সওয়া যায়, কিন্তু মেয়ে-জ্যাঠা একেবারেই সয় না! ওকি—মুখ অন্ধকার কল্লেন যে? দোহাই আপনার, আপনাকে গায়ে পেতে নিতে আমি কোন কথাই বলিনি। আমি বল্‌চি, যাঁরা নিজেদের শক্তিতে সমাজের ধারা বদ্‌লাতে চান, তাঁদের কথা। যাঁদের মাকড়সা দেখ্‌লে মূর্চ্ছা হয়, তাঁদের মুখে অত লম্বাই-চৌড়াই মানায় না। যাঁরা আমাদের সাহায্য চান, খুসী হ'য়ে আমরা তাঁদের সাহায্য কর্‌তে পারি। কিন্তু যাঁদের পদে পদে আমাদের সাহায্যের আবশ্যক, তাঁরা যদি মুখে বলেন—‘ডোণ্টকেয়ার’—তা হ'লে সহ্য করা বাস্তবিকই অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। আচ্ছা, আমি তা হ'লে এখন আসি—কথাগুলো অবকাশমত ভেবে

দেখ্‌বেন”—বলিয়া সে হাসিতে হাসিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

সকালের দিক্ হইতে ঝুপ্‌ঝুপ্ করিয়া অবিশ্রান্ত একঘেয়ে বৃষ্টি পড়িতেছিল। ভোরের সময় বৃষ্টি সুরু হইয়াছিল, বেলা তিনটা বাজে, এখনও তাহার ভাবের কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। একঘেয়ে বৃষ্টির শব্দে মনও যেন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। বাগানে যাইবার উপায় নাই। খোকা তাহার কাকার ঘরে। মেঘলা দিনের আকাশের ন্যায় অন্ধকার মন লইয়া অমিয়া তাহার নিজের ঘরে বসিয়া কতকগুলি প্রুফ দেখিতেছিল। অনেকদিন এগুলি আসিয়া পড়িয়া আছে, ভাল লাগে না, তাই খুলিয়া দেখা হয় নাই। আজ নিতান্তই দিন কাটিতেছিল না, তাই অত্যন্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সেগুলি বাহির করিয়া কাট্‌কুট্ করিতে বসিয়াছিল। তবু কাজের মধ্যেই মন তাহার উধাও হইয়া ক্ষণে ক্ষণে দূরে কোথায় চলিয়া যাইতেছিল। মনের মধ্যে একটা অভাব—ঠিক্ বোঝা যায় না। তবু কি একটা অজানা ভাব আজ-কাল যেন সারা মনটাই জুড়িয়া রাখে। এই নূতন অজ্ঞাত ভাবটিকে সে যেন ধরিতেও পারে না—ছাড়িতেও চাহে না।

কিছুদিন পূর্ব্বে সে মনে মনে স্থির করিয়াছিল, মিস্ চৌধুরীর কথা রাখিবে—এখানকার এমন সব প্রাকৃতিক

ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া সে গ্রন্থ রচনা করিবে, যাহা জগতে সম্পূর্ণই নূতন "নারীর বিদ্রোহ" পুস্তকের চেয়ে তাহা কোন অংশে হীন হইবে না। আর এই উপাদেয় প্রবন্ধগুলি যখন মাসিকপত্রিকা "আরতি"র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিবে, তখন স্থধুই নীরস সংস্কারক বলিয়া লোকসমাজে তাহার নাম আলোচিত হইবে না। অন্তঃসলিলা ফল্গু-স্রোতের ন্যায় তাহার অন্তঃ-প্রবাহিত রসধারার শীতল স্পর্শে পাঠকগণ স্থধু বিস্মিত নয়—মুগ্ধও হইয়া যাইবে।

কল্পনা কিন্তু কল্পনাতেই রহিয়া গিয়াছে; এ পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যে লাগাইবার কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। গ্রন্থ লিখিবার উপযোগী সময় ও সরঞ্জামের অপ্রতুল ছিল না। চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনের মধ্যে যথেষ্ট কবিত্ব সঞ্চারও করিয়া থাকে। তবু সেগুলির সদ্ব্যবহার হইয়া উঠে না। চিন্তার ধারা সমস্তই যেন উল্‌টা-পথে বহিতে থাকে। এমন কি, তাহার চিরদিনের দৃঢ়-বিশ্বাসের মূল কখন যে ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া পুরুষজাতির প্রতি তীব্র ঘৃণার ভাবটি কমাইয়া দিতেছিল, তাহা সেও যেন ধরিতে পারিতেছিল না।

প্রাণতোষবাবুর ন্যায় উচ্চ-শিক্ষিত মানুষ যে কেমন করিয়া এই সব নির্ব্বোধ চাষাভুষার দলে, তাহাদের সুখ-

দুঃখে সহানুভূতিতে একচিত্ত হইয়া চিরদিনের বাসভবন বাঁধিয়া শান্ত নিরুদ্বেগ জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারেন—সে যেন তাহা অনুমানও করিতে পারে না। কি অসাধারণ অধ্যবসায় ও অর্থব্যয়ে বিজ্ঞানের নব নব কৌশলে এবং দেশ-দেশান্তর হইতে নানা উপাদান সংগ্রহ করিয়া এই বন্য-ভূমিতে নন্দনের সৌন্দর্য্য—ও অব্যবহৃত জঙ্গলময় দেশের সংস্কার করিয়া দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দেশবাসীর প্রচুর খাদ্যের সংস্থান করিয়া দিয়াছেন! অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয়ে নিজব্যয়ে দুইজন উৎসাহী যুবককে শিক্ষকরূপে রাখিয়া, ও নিজে সঙ্গী হইয়া নিরক্ষর বনবাসীদের অজ্ঞানান্ধকারা-বৃত-চিত্তে জ্ঞানের আলোক ও আনন্দ বিতরণ করিতে-ছেন! এমন অক্লান্ত কর্ম্মী, এমন উচ্চ-হৃদয়—যদি শ্রদ্ধা পাইবার যোগ্য না হয়, তবে শ্রদ্ধার যে মূল্য থাকে না! মীনাকেও তিনি ভালবাসেন। ঠিক্ সম-অধিকারে কোদাল হাতে মীনা তাঁহার চাষের কাজে পাশে গিয়া না দাঁড়াক্, তবু তাহাকে ঠিক্ দাসী বলা যায় না।

অমিয়ার মনে হইতেছিল, মীনার ভাগ্য ভাল—কাঁটা-বনের মধ্যেও সে গন্ধরাজের আশ্রয় পাইয়াছে। জগতে সবাই যদি প্রাণতোষবাবু হইতেন, তবে আর দুঃখ ছিল কি? রণেন্দ্রের কথা অনিচ্ছাতেও বারবার তাহার মনে

উদয় হইতেছিল, কিন্তু মনকে সে জোর করিয়া এ চিন্তা হইতে বিরত রাখিতে চাহিতেছিল। মনে মনে বলিতে-ছিল—"তাঁহার সংবাদে আমার প্রয়োজন কি"? আর বোধ করি কোন মেয়েরই কখন তাহা প্রয়োজন হইবে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নদীজলে

নদী-কিনারে দূরবিস্তৃত বালুর চর। বর্ষায় কখন কখন চর ডুবিয়া যায়, ক্ষুদ্রা নদী বিপুলকায়া হইয়া উঠে। প্রতি-বৎসরই যে এমন হয়, তাহা নহে—যেবার জল বাড়ে, সেই-বারই এমন হয়। নদীর জল বাড়ায় দেশের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। তাহার কারণ—নদীতট বহু উচ্চ, দ্বিতল পরিমাণ। তীরভূমি হইতে নদীটিকে অনেক নিম্নে দেখায়। ইচ্ছা করিলেই যেখানে সেখানে নামিতে পারা যায় না। মানুষের নিত্য-ব্যবহারের জন্য স্থানে স্থানে নদীতে নামিবার জন্য ঘাট আছে।

প্রাণতোষবাবুর কৃষিক্ষেত্রে জল-সেচনের জন্য যে ঘাট-টিতে পাম্প বসান হইয়াছিল, সেইটি কেবল পাকা ইটের গাঁথা। বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া অমিয়া এ ঘাট-গুলি অনেকদিন দেখিয়া গিয়াছে। এসব ঘাটে লোকজন প্রায়ই আসে। গ্রাম্য-ছেলে মেয়েরা অনেক সময় আশ্চর্য্য-দর্শনের ন্যায় অবাক্ হইয়া তাহাকে চাহিয়া দেখে। ইহাতে

সে মনে মনে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে থাকে। তাই লোকচক্ষুর বাহিরে থাকিবার ইচ্ছায় সে আজ তীরে তীরে চলিয়া, অন্যমনে একেবারে বাড়ী হইতে অনেকখানি দূরে আসিয়া পড়িয়াছিল। এখানটা নদীর একটা বাঁক; নদীও এখানে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত হইয়া আসিয়াছে। পর-পারে সূর্য্যাস্তের শোভা দেখা যাইতেছিল। নদীজলে তাহারই অপরূপ আলোকস্রোত বহিতেছিল। অমিয়া নদী-তীরে বসিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহাই দেখিতেছিল।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্য ডুবিয়া অপরাহ্ণ বেলার অন্ধকার-ছায়া ঘনাইয়া আসিল। নদীজলে ও গাছের মাথায় 'হা হা' হাসির লহর তুলিয়া আচম্‌কা একটা ঝড়ের বাতাস ধূলা উড়াইয়া বহিয়া গেল। অমিয়া চাহিয়া দেখিল, আকাশে স্তরে স্তরে মেঘ জমা হইতেছে—এখনি একটা ঝড় বৃষ্টি আসিল বলিয়া। সে ব্যস্ততা অনুভব করিয়া তাড়া-তাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইতেই, অনবধানে তাহার শালের রুমাল-খানি ক্রোড়চ্যুত হইয়া জলের দিকে গড়াইয়া পড়িয়া গেল। একেবারে নীচে পড়িল না, মধ্যপথে একটা বন্য গাছের শাখায় বাধিয়া ঝুলিয়া রহিল। আর একটা দমকা-বাতাস আসিলেই হয়ত এখনি নদীজলে পড়িয়া যাইবে। শালখানি দামী ও সৌখীন। ফিরিবার সময় কোন কোন দিন শীত

অনুভূত হয়, তাই আজই কেবল সেখানি সঙ্গে আনিয়াছিল। ব্যবহারের প্রয়োজন না হওয়ায় কোলের উপরই ফেলিয়া রাখিয়াছিল।

প্রথমে সে সাহায্যের আশায় ইতস্ততঃ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—কোথাও জনমানবের চিহ্নমাত্রও নাই। নিজের প্রতি রাগ ধরিতেছিল, ইচ্ছা করিয়াই সে যে আজ নিজেকে লোকালয় হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছে? ফিরিয়া গিয়া লোক ডাকিবার সাহস হয় না—হয়ত ততক্ষণে পবনদেবের অনুগ্রহে শালখানি উড়িয়া নদীজলে পড়িয়া চিরদিনের জন্য দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া যাইবে। অথচ এখান হইতে নামিবার কোন পথ নাই। সে তীরের উপর উবুড় হইয়া, যতদূর হাত যায় হাত বাড়াইয়া দেখিল, হাত পৌঁছাইল না; কিন্তু আর একটুখানি,—একটুখানি মাত্র আগাইলেই ধরিতে পারা যাইবে। সে জুতা খুলিয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়া দেখিল, পায়ের আঙ্গুলের সাহায্যে ধরিতে পারা যায় কি না। এই যে নরম নরম মসৃণ পশমের চাদরখানি তাহার পায়ের তলায় লাগিতেছে, কিন্তু তবু ইহাকে উঠান যায় না কেন? হয় ত কাঁটা-গাছের কাঁটায় আট্‌কাইয়া গিয়া থাকিবে; টানাটানি করিতে গেলে এখনি ছিঁড়িয়া যাইবে। সে আর একটুখানি শরীর ঝুঁকাইয়া পা দিয়া সাবধানে শালখানি

ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার শরীরের ভরে, অথবা সেখানকার মাটি আলগা থাকায়, যে কারণেই হইক, কতকটা তীর-ভাঙ্গা মাটির চাপের সহিত সে গড়াইয়া সু-উচ্চ তীরভূমি হইতে একেবারে নদী-কিনারে আসিয়া পড়িল।

এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনায় সে এমনি স্তম্ভিত হইয়া গেল যে, গড়াইয়া পড়িবার সময় কঠিন মৃত্তিকাস্তূপে ও আগাছায় তাহার দেহের স্থানে স্থানে ছড় লাগিয়া ও কাপড় ছিঁড়িয়া গেলেও সে তাহা অনুভব করিতে পারিল না। যাহার জন্য এই বিপত্তি, সেই হারানিধি শালখানি তাহার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়িয়া গিয়া বালুর উপর লুটাইতেছিল। অমিয়া চাহিয়া দেখিল, কিন্তু অভিমানের বৈরাগ্যে তাহাকে উঠাইয়াও লইল না—উহারই অবাধ্যতার জন্য আজ তাহার এই দুরবস্থা !

অন্ধকার ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছিল। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ আসন্ন ঝড়ের সম্ভাবনা বুঝাইয়া দিল। নদীর কলোচ্ছ্বাস, স্থানটি যে নিরাপদ নহে, তাহাই যেন কান্নার সুরে জানাইতেছিল। নদীতীরে যতদূর দৃষ্টি যায়, অমিয়া চাহিয়া দেখিল, উপরে উঠিবার কোথাও পথরেখা দৃষ্ট হয় না। পাহাড়ের মত উচ্চ তীরভূমি। নদীজলও সমরেখা

বিশিষ্ট নহে। কোথাও তীর হইতে দূরে, কোথাও একেবারে তীর ঘেঁসিয়া চলিয়া গিয়াছে। ধারে ধারে চলিয়া সে যে কোনো ঘাটে গিয়া পৌঁছাইবে তাহারও সম্ভাবনা নাই।

তাহার চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল। সে ভাবিয়া পাইল না, এ অ-স্থানে কে তাহার সংবাদ লইতে আসিবে। এ সম্ভাবনা কাহারই বা মনে হইবে? এত রাত্রি পর্য্যন্ত সে ত কখন বাহিরে থাকে না। মীনা হয় ত এতক্ষণ উত্তমকে হ্যারিকেন লইয়া তাহার খোঁজে পাঠাইয়াছে—আহা উত্তম যদি এদিকে আসে! কিন্তু কেনই বা তা আসিবে? সে ত তাহার মত পাগল নয়, যে এই লোকালয়ের বাহিরে পাহাড়ের মত উঁচু পাড় হইতে লাফ দিয়া জলে পড়িবার সম্ভাবনা কল্পনা করিতে পারিবে? সে যখন সম্ভাবিত স্থানগুলি খুঁজিয়া দেখিয়া বাড়ী গিয়া খবর দিবে—'কোথাও পাওয়া গেল না'—তখন সেখানে কি রকম ভয় ভাবনা পড়িয়া যাইবে! মীনা হয় ত কাঁদিতেই আরম্ভ করিবে। অমিয়া কল্পনায় সে দৃশ্যটি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছিল। প্রাণতোষবাবু লণ্ঠন-হাতে উত্তমকে অনুবর্ত্তী হইবার আদেশ দিয়া আর একবার খোঁজা জায়গাগুলি হয়ত খুঁজিয়া দেখিবেন। তারপর শুষ্কমুখে বাড়ী ফিরিয়া

হতাশভাবে ইজিচেয়ারে শুইয়া পড়িবেন। আর রণেন্দ্র?—তিনি হয় ত দিব্য নিশ্চিন্ত-মুখে ফিলজফির পাতা উল্টাইয়া যাইবেন—তাঁহার নিরুদ্বেগ-মুখে এতটুকু চাঞ্চল্যের ছায়াও ফুটিবে না।

রণেন্দ্রের এই কল্পিত নির্ম্মমতা স্মরণে অমিয়া মনে মনে যেন পীড়িত হইল। কল্পনার স্বপ্ন শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া গেল। মনে হইল, সে যেন পায়ের তলায় শীতল জলের স্পর্শ অনুভব করিতেছে। নদীতে জল বাড়িতেছে নাকি? হয়ত তাই! সে শেষ-চেষ্টায় আর একবার মাটীর দেওয়ালে ফাটলের মধ্যে যে সকল আগাছা জন্মিয়াছিল, তাহাই ধরিয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করিল। অসম্ভব! মাটী ধরিতে গেলে ধস্ ভাঙ্গিয়া পড়ে। আল্‌গা মাটীর উপরকার ছোট ছোট শিকড়শুদ্ধ গাছগুলা উপাড়িয়া আসে, অন্ধকারে চোখে মুখে শুষ্ক মাটীর চাপ ঝরিয়া পড়ে, লাভের মধ্যে যন্ত্রণার সীমা থাকে না। মানুষের যতক্ষণ আশা থাকে, ততক্ষণ সে তৃণগাছিও অবলম্বনের চেষ্টা করে। কিন্তু আশা ফুরাইলে আর তাহার ভয় ভাবনা কিছুই থাকে না।

অন্ধকারে পথহীন অচিন্ত্যনীয় বিপদের মুখে সে যখন পায়ের তলার শীতলস্পর্শ হাঁটুর কাছাকাছি আসিয়াছে অনুভব করিল, তখন এমন একটা শারীরিক ও মানসিক

অবসাদ অনুভব করিল যে, ভয়ের হেতুটা নিকটাগত বুঝিতে পারিয়াও সে আর যেন ভীত হইল না। মনে হইল, এই চন্দ্রনক্ষত্রহীন নদী-বক্ষেই তাহার নিয়তি হয় ত তাহাকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে। তটাহত জলের কলধ্বনিতে সে যেন মরণেরই সুর শুনিতে পাইতেছিল। নদী তাহাকে আদর করিয়া ডাকিতেছিল, "আয় আয়।" জলস্থল শূন্য ব্যোম যেন স্তব্ধ হইয়া তাহারই পানে চাহিয়া ছিল। তাহাকে বিদায় দিবার জন্য কেহ কোথাও অপেক্ষা করিয়া নাই। অমিয়ার মনে পড়িল—মাসীমার কথা। মাসীমা যখন ফিরিয়া আসিয়া সব শুনিবেন, কি দারুণ দুঃখের ব্যথায় তাঁহার জীর্ণ অন্তর বিদীর্ণ হইয়া যাইবে! কলিকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জায় মরিলেই ত চুকিয়া যাইত? এমন সুস্থ-দেহে অকারণে জলে ডুবিয়া মরার চেয়ে সে যে সহস্রগুণে প্রার্থনীয় ছিল।

মরণ নিকটাগত বুঝিয়া এইবার সে মনে মনে ভগবানের নাম স্মরণ করিতে লাগিল। আকাশে একটুখানি চাঁদ উঠিয়াছিল। ক্ষীণ ম্লান আলোকে অমিয়ার মনে হইল, দূরে নদীবক্ষে কি যেন একটা ভাসিয়া আসিতেছে। জেলে-দের মাছ ধরিবার নৌকাও হইতে পারে। কিন্তু সে কেমন করিয়া নিজের অস্তিত্ব উহাদের কাছে জানাইবে? চীৎকার

করিলে শুনা যাইবে কি? কি বলিয়া চেঁচাইবে? মনে করিল, চীৎকার করিয়া নৌকারোহীর মনোযোগ আকৃষ্ট করিবে, কিন্তু কণ্ঠ হইতে একটি শব্দও নির্গত হইল না। উপায় বুঝি করতলগত হইয়াও আবার ফিরিয়া যায়। হা ভগবান, শেষে কি সত্য সত্যই অপমৃত্যু লিখিয়াছিলে?

কিছুক্ষণের জন্য সে যেন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া গিয়াছিল। যখন হুঁস্ হইল, সে চাহিয়া দেখিল, একখানি ক্ষুদ্র জেলে-নৌকা তাহার অত্যন্ত নিকটে আসিয়া থামিয়াছে। নৌকারোহী মাঝিকে নৌকা ধরিবার হুকুম দিয়া জলের ভিতর নামিয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্ষীণ চাঁদের আলোয় তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখা যাইতেছিল না। অমিয়ার দৃষ্টির উপরেও কুয়াশার জাল বুনিয়া আসিতেছিল, তবু চাহিয়া সেই মুহূর্ত্তেই চিনিল—সে রণেন্দ্র। তাহার পর কি যে ঘটিল, কিছুই আর তাহার স্মরণ হয় না।

ভাল করিয়া যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, সে অনুভব করিল, সে যেন কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছে। চাহিয়া দেখিয়া বুঝিল, সে নৌকার উপর শয়ন করিয়া রহিয়াছে। বুড়া মাঝি তাহার মাথার কাছে বসিয়া ছিল—রণেন্দ্র হাল ধরিয়া আছে। অমিয়াকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া মাঝি আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিল—"ভাগ্যো আজ বাবুর ঝরণা

দেখ্‌তে যাওয়ার সখ হয়েছিল, নৈলে ত আমরা এ পথে কক্ষণই আস্‌তাম না। কেউ-ই আস্‌ত না! নদীতে ঢল নেমেচে, আমরা এসে না পড়লে এতক্ষণ মাঠাকৃরুণকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলে যেত, আর কি খুঁজে পেতাম! আমি ত নৌকা ভিড়ুতেই চাইনি, বলি ওখানে কি আর এমন সময় মানুষ থাকে—থাকেন ত অপদেবতাই থাক্‌বেন। বাবু কেবল জোর করে নিয়ে এলেন।”

চাঁদ তিন ভাগ উঠিয়াছিল। নদীজলে চাঁদের আলো শোভা বিস্তার করিতেছিল। পরপারে দূরে পাহাড়ের অস্পষ্ট দৃশ্য গাছপালা নদীতীর অন্ধকারে বিস্তীর্ণ উচ্চাবচ স্তূপের ন্যায় দেখাইতেছিল। অমিয়ার জামা কাপড় সমস্তই জলে ভিজিয়া গিয়াছিল, শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সে সেই অন্ধকারের দিকেই চাহিয়া রহিল। এই মাত্র যাঁহার দয়ার ঋণে সে বদ্ধ হইয়া মরণের দ্বারপ্রান্ত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, ইচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে একটা কৃতজ্ঞতার বাণীও সে জানাইতে পারিল না। তাহার শোচনীয় দুরবস্থার সাক্ষী এই মানুষটির করুণার দৃষ্টি কল্পনা করিতেও তাহার শীতার্ত্ত হৃদয় যেন শীতে জমিয়া আসিতেছিল। তবু সেই লজ্জার দুঃখের অভ্যন্তরে সুখের একটি অতি ক্ষীণ আনন্দের ধারাও বুঝি মৃদুভাবে বহিতেছিল—রণেন্দ্রই তাহাকে মৃত্যুর

মুখ হইতে বাঁচাইয়া আনিয়াছে। ইহাতে লজ্জা যতই থাক, সুখও বুঝি অনেকখানি ছিল। বিশ্লেষণ করিয়া সে ইহার গতি নিরুপণের চেষ্টা করিল না, শুধু মনের অত্যন্ত গোপন অংশে আনন্দের আভাস অনুভব করিতেছিল।

নৌকা তীরে লাগিলে রণেন্দ্র লাফাইয়া নিজে নামিয়া, অমিয়ার সাহায্যের জন্য হাত বাড়াইয়া দিয়া যখন সহজভাবে কহিল—"জায়গাটা ভারী পিছল, হাত ধরুন, নৈলে পড়ে যাবেন" সে তখন যে হাতে পুরুষ-বিদ্রোহে কলম ধরিয়াছে, সেই হাতেই শত্রু-পক্ষীয়ের সাহায্য গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিল না। মাঝি তাহাদের সঙ্গে বাড়ী পর্য্যন্ত আসিল। রণেন্দ্র তাহাকে বক্‌শিস্ দিয়া বিদায় করিল।

মীনা এতক্ষণ অমিয়ার জন্য দুশ্চিন্তায় অস্থির হইয়া বাড়ীসুদ্ধ সকলকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। নিরানন্দ-গৃহে আবার আনন্দের হাসি ফুটিল।

নবম পরিচ্ছেদ

খোকার পীড়া

পরদিন সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া গায়ের ব্যথায় অমিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারিল না। তিন ঘণ্টা জলের উপর মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকা যে মরণের চেয়ে কম কষ্ট নহে, তাহা সেইদিন সে অনুভব করিয়াছে। কঠিন মৃত্তিকার দেওয়ালের উপর দিয়া গড়াইয়া পড়ায়, পিঠে কোমরে বেদনাও বেশ হইয়াছিল। কিন্তু শুইয়া থাকিয়াই যখন সে পার্ব্বতীর কাছে খোকার খবর লইয়া শুনিল, রাত্রে তাহার ভারী জ্বর আসিয়াছে এবং এখন পর্য্যন্ত সমভাবেই আছে, তখন বিছানায় নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকা আর সম্ভব হইল না। খোকাকে সত্যই সে বড় ভাল বাসিয়াছিল। নারী চিরদিনই নারী! বাহিরে নিজেকে সে যতখানি কঠিন করিয়া তুলিতে চেষ্টা করুক্—শিক্ষা তাহাকে যে পথেই চালিত করুক্—তবু তার অন্তরের গোপন অংশে জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার লইয়া যে সেবা-পরায়ণা

নারী-হৃদয়ে বাস করিতেছিল, তাহাকে সে অন্তরের বাহির করিয়া দিতে সমর্থ হয় নাই। সেই ক্ষুদ্র শিশুর স্নেহপাশে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে নিজেকে সে যে এমনভাবে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা সে কখন কল্পনাও করিতে পারে নাই। খোকার পীড়ার সংবাদ পাইয়াই আচম্‌কা প্রথমেই তাহার মনে হইল—'সর্ব্বনাশ! পীড়া যদি বেশী হয়! খোকা যদি না বাঁচে!' নিজের এই হীন আশঙ্কায় নিজের প্রতিই সে মনে মনে বিরক্ত হইতেছিল। ছি ছি—এত দুর্ব্বলচিত্ত সে? তবু ভয় কমিতেছিল না।

পার্ব্বতী বলিল—"বাবু সহর থেকে ডাক্তার আন্‌তে গিয়েচেন। কাকাবাবু বল্‌চেন জ্বরটি সোজা নয়, বাঁকা পথে যাবে।" তবে? অমিয়া ভাবিয়া পাইল না যে খোকার অসুখের সংবাদে সে এত ব্যাকুল হইতেছেই বা কেন? সংসারে,ত অনেক খোকারই অসুখ হইয়াছে, কৈ, সে ত তাহাদের জন্য এতটুকুও ব্যস্ত হয় নাই! মনের এই দুর্ব্বলতাটিকে প্রশ্রয় দিবে না বলিয়াই সে আজ চেষ্টা করিয়া অনেক বিলম্বে খোকাকে দেখিতে গেল। কিন্তু মনের কাছে এ ছলনা সে বেশীদিন রাখিতে পারিল না। খোকার রোগের গতি ক্রমেই যেন বাঁকা পথে চলিতেছিল। বাড়ীর লোকে ভয় পাইলেন।

খোকার অসুখের সময় তাহার সান্নিধ্য ছাড়িয়া দূরে দূরে থাকা অমিয়ার পক্ষে যে কতখানি কষ্টকর, তাহা সেই যে কেবল বুঝিতেছিল এমন নহে—মীনাও তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভব করিতেছিল। তাই প্রথমে এদিকটা কেন ভাবিয়া দেখে নাই বলিয়া নিজেরই তাহার লজ্জা বোধ হইতেছিল। এক সময় কাজের ছুতায় বাহিরে গিয়া সে অমিয়াকে খোকার কাছে পাঠাইয়া দিল। এবং পরেও তাহাকে আর সে কাজে ছুটি দিল না; কহিল—"ছেলে নিয়ে আট্‌কে বসে থাক্‌লে কি আমার চলে ভাই? ও তোমার ছেলে তুমিই ওকে দেখ।"

তৃষ্ণার্ত্তকে শীতল জলাশয় দেখাইয়া দিলে সে তাহার সান্নিধ্য ছাড়িয়া যাইতে চাহে না। অমিয়া তাহার স্নেহাধারের পার্শ্বে যে অচল আসন পাতিয়া বসিল, সেখান হইতে উঠিবার কথা তাহার যেন আর মনেই পড়িল না। নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত সে একবারও স্বেচ্ছায় খোকাকে ছাড়িয়া যাইত না। ইহাতে প্রথম প্রথম রণেন্দ্রের কিছু অসুবিধা হইতেছিল। তবু সঙ্কোচ ঠেলিয়া অনেক সময়ই তাহাকে সেখানে উপস্থিত থাকিতে হইত। অমিয়ার গায়ে পড়িয়া সেবার ভার লওয়া প্রথম দৃষ্টিতে তাহার অপ্রীতি আনিয়াছিল। কিন্তু সেবিকা যে কতখানি আন্তরিকতার সহিত

রোগীর প্রতি মনোযোগিনী, তাহা অনুভব করিতেও তাহার অধিক বিলম্ব হয় নাই। সন্দেহ হইত—মীনাও হয় ত এমন নিপুণতার সহিত রোগীর সেবা করিতে পারিত না। অমিয়ার প্রতি একটুখানি সম্ভ্রমের সহিত রণেন্দ্রর মনে তাই অনেক-খানি বিস্ময়েরও সঞ্চার হইতেছিল। এই মেয়েটিকে সে কি তবে এতদিন সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়া অবিচার করিয়া আসিতেছে? কয়দিনের অনাহার অনিদ্রা, দুশ্চিন্তায় তাহার শুষ্ক কৃশমুখে যে মাতৃমূর্ত্তি ফুটিয়াছিল, তাহাকে যে অশ্রদ্ধা বা অস্বীকার করা যায় না—ইহা সে মনের কাছে স্বীকার না করিয়া পারিল না।

বিছানার দুই পাশে বসিয়া এই দুইটি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ-মতের নরনারী যখন সেই একখানি যন্ত্রণাকাতর মুখের পানে চাহিয়া সমান ব্যাকুলতায় তাহার যন্ত্রণা নিবারণের প্রয়াস পাইত—তাহার এতটুকু কণ্ঠস্বরে—একটুখানি অবস্থা পরিবর্ত্তনে সমান উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিত, তখন বাহিরের কোন লোক দেখিলে মনে করিতে পারিত না যে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে মতের এতটুকুও অনৈক্য থাকিতে পারে। হয় ত ভাবের উত্তেজনায় সমান স্বার্থে তাহারাও নিজেদের চিরদিনের বিদ্বেষ তখনকার মত ভুলিয়া গিয়া থাকিবে। অনেক সময় পালা করিয়া তাহাদের খোকার কাছে থাকিতে

হয়—সে সময় অমিয়ার তুলনায় শিশুর সেবায় নিজের অপটুত্ব রণেন্দ্র পদে পদেই অনুভব করিয়া থাকে। গ্রামে ডাক্তার নাই; দূরান্তর সহর হইতে ডাক্তার আনিতে হয়। ডাক্তারের আদেশ মীনাকে জানাইতে গেলে সে স্বচ্ছন্দে অমিয়াকে নির্দ্দেশ করিয়া বলে—"আমায় কেন ও সব, শেষ কি এক করতে আর করে বসব? ওঁকে বলুন।" অমিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সমস্ত শুনিয়া লয় এবং এমনি স্নেহের সহিত যথাকর্ত্তব্য সম্পন্ন করে যে, রণেন্দ্র আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া মনে ভাবে—'অমিয়া না থাকিলে খোকার সেবাযত্ন কেমন করিয়াই না জানি চলিত!' কিন্তু এই একান্ত ঘনিষ্ঠতার ফলে তাহারা যে পরস্পরে মনের মধ্যেও কতখানি কাছাকাছি আসিয়া পড়িতেছিল—সে সংবাদ তাহারা মোটেই জানিতে পারে নাই।

এমন সময় প্রাণতোষ বাবুর ক্ষেতের কাজ পড়িয়াছে, সহরে জিনিষ চালান দেওয়া হইতেছিল। পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করিয়া মাল পাঠাইবার গাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে। চালান বন্ধ রাখিলে এ বৎসর আর গাড়ী পাওয়া যাইবে না; সারা বৎসরের একান্ত পরিশ্রমের ফল নষ্ট হইয়া যাইবে। তিনি কাজের মানুষ। কাজকে উপেক্ষা করা তাঁহার স্বভাবও নহে। তা ছাড়া আর একটা কারণ ছিল—রণেন্দ্র

ও অমিয়া যেভাবে তাঁহার ছেলের ভার লইয়াছিল, তাহাতে তৃতীয় ব্যক্তির প্রয়োজনও সেখানে ছিল না। সেখানে দখল লইতে গেলে এই দুইটি একনিষ্ঠ সেবাব্রতধারী তরুণ তরুণীর মনের উপরও হয়ত অলক্ষ্যে দাবীদারের কঠিন হস্তের স্পর্শ লাগিয়া অন্যায় হইতে পারে। তাই বাপ মা সসঙ্কোচে দূরে দূরেই থাকিতে চেষ্টা করিতেন। হয় ত মনের গোপন প্রান্ত হইতে সেই সঙ্গে একটা লুব্ধ আশার বাণীও শুনিতে পাইতেন—তাঁহাদের ভাগ্যে ছেলে যদি নাই বাঁচে উহাদের পুণ্যেও কি রক্ষা পাইবে না?

দশম পরিচ্ছেদ

মীনার দুষ্টামি

খোকা চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়াছিল। চোখ মেলিয়া তাকাইতেছিল না—কেমন নির্জ্জীব ভাব। অমিয়া রণেন্দ্রের পানে চাহিয়া ব্যাকুল স্বরে কহিল—"খোকা যে ভারী দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌ল!"

রণেন্দ্র কাছে আসিয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া কহিল—"ভয় নেই, ভালই আছে। খালি দুর্ব্বল—ফুডের সঙ্গে ফোঁটাকতক ব্রাণ্ডি দিলেই ও ভাবটা সেরে যাবে" বলিয়া আস্তে আস্তে ঘরের বাহির হইবার ইচ্ছায় অগ্রসর হইতেই অমিয়া কাতর অনুনয়ের সুরে পুনরায় কহিল—"একবার ডাক্তারকে খবর দিলে হত না? খেতেও যে পাচ্চে না কিছু!"

রণেন্দ্র ফিরিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া তাহার উদ্বেগব্যাকুল মুখের পানে চাহিয়া, যেন সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। তবু সহজ সুরেই কহিল—"কেন ভয়

পাচ্চেন ? হঠাৎ জ্বরটা ছাড়ায় অমন কাহিল হয়ে পড়েচে, ভয়ের কোন কারণই ত নেই ?” বলিয়া সে বাহিরে না গিয়া, একখানা ডাক্তারী বই খুলিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। অমিয়া যে একান্ত নির্ভরে আজ তাহার কাছেই সাহায্য চাহিতেছে, ইহা সে মনে মনে বেশ বুঝিতেছিল। তবু আশ্চর্য্য এই—আজ আর সেই পুরুষ-বিদ্বেষিণী স্বাধীনতা-প্রয়াসিনী অহঙ্কৃতা নারীর পরাজয়-স্বীকারে বিজয়-গর্ব্ব অনুভবের পরিবর্ত্তে, সে যেন তাহার ব্যথার অংশটুকুই কেবল মনের ভিতর অনুভব করিতেছিল।

খোকা যেমন আরোগ্যের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল, রণেন্দ্রও সেই অনুপাতে নিজকে তাহার সঙ্গবিচ্যুত করিয়া লইতেছিল। এখন ডাকিয়া না পাঠাইলে সে আর বাড়ীর ভিতর প্রায় আসে না। আসিলেও মন খুলিয়া কাহারও সহিত কথা কহে না। মীনার সহিত যাহা লইয়া তাহার নিত্যকার বিবাদ ছিল, সেই পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া এখন আর কোন তর্ক উঠে না। মীনা তুলিলেও সে এড়াইয়া যায়।

সে যেন চেষ্টা করিয়া নিজেকে সুদূর গণ্ডীর ভিতর বদ্ধ করিয়া রাখিতেছিল। তবু মন যে তাহার স্বচ্ছন্দ নহে—তাহা গোপনতার প্রয়াসেই প্রকাশ হইতেছিল। অমিয়ার

সহিত খোকার সম্বন্ধে যদিই কোন ডাক্তারি আলোচনার প্রয়োজন ঘটে, সে তাহা যথাসম্ভব সংক্ষেপে ও সম্ভ্রমের সহিত সারিয়া লয়। মীনার সঙ্গে আজকাল আর কৃত্রিম কলহের তাহার অবকাশই মিলে না। মীনা তাহার নির্লিপ্ত দূরত্বে রাগ করিলে গম্ভীর মুখে বলে—"দাদার হিসেবপত্র দেখ্‌চি, সময় কোথা বলুন গল্প কর্‌বার?" প্রাণতোষবাবু কিন্তু একদিন মীনাকে চুপি চুপি বলিয়াছিলেন—"রণেন্‌কে দিয়ে আজকাল যদি কোন কাজ পাওয়া যায়। দেড় হপ্তা হল একটা হিসেব চেক্ কর্‌তে দিয়েচি, আজও তা শেষ হল না। কি করে' বল দেখি সারাক্ষণ? সর্ব্বদাই কেমন অন্যমনস্কভাব।" মীনা হাসিয়া স্বামীকে জবাব দিয়াছিল—"আমি কি 'স্পাই'—যে তোমার ভাইয়ের কাজের উপর চৌকী দেব?"

আমরা কিন্তু বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে, এই নিন্দনীয় অসৎ কর্ম্মটিই সে আজকাল অনেক সময় গোপনে সম্পাদন করিয়া থাকে। রণেন্দ্রের অনুপস্থিতির সুযোগে সে তাহার খাতাপত্র বই কাগজগুলি নাড়াচাড়া করিয়া দেখে—নিজের অনুকূলে কোন গোপন রহস্য সেখানে আবিষ্কার করিতে পারা যায় কি না। সে কেতাবে পড়িয়াছে প্রণয়ীরা বইয়ের মলাটে, খাতাপত্রে মনের ভাব

লিখিয়া রাখে। অনেক সময় অকারণে তাহার মনে আঘাত দিয়া সে যেন অমিয়ার উপর তাহার মনের ভাবটুকু বাহির করিয়া লইবারও প্রয়াস পায়।

একদিন কাছে পাইয়া সে রণেন্দ্রকে ধরিয়া বসিল—"ঠাকুরপো, তুমি যে হঠাৎ এমন দুর্ল্লভ হ'য়ে উঠ্‌লে—ব্যাপারখানা কি বল দেখি?"

অমিয়া আসিয়া পড়ায় রণেন্দ্রের মুখ কাণ সমস্তই রাঙ্গা হইয়া উঠিল। মীনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে সে যে নিজেকে লুকাইতে পারে নাই তাহা বুঝিয়াও কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ ভরিয়া কহিল—"সুলভ ছিলেম তা হলে বলুন। আশ্চর্য্য! আমি কিন্তু চিরদিনই এর উল্টো কথা শুনে আস্‌চি আপনার মুখে। আপনার উদ্ভাবনী শক্তির চেয়ে বিস্মরণী শক্তিই প্রশংসনীয়—সন্দেহ নেই" বলিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে মীনা কহিল—"সব কথা ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিলেই ত আর উড়্‌বে না! সেদিন তোমার সঙ্গে ঝরণা দেখ্‌তে যাবার কথা বলায় অমিয়া বল্লে—'তিনি কি যাবেন? তিনি ত এদিকেই আর ঘেঁসেন না'—জিজ্ঞাসা কর না ঐ ভদ্রলোককে—উঁনি আর মিথ্যে সাক্ষী দেবেন না?" বলিয়া দ্বার সমীপাগত অমিয়ার পানে চাহিয়া সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

খোকার খোঁজে আসিয়া রণেন্দ্রকে দেখিয়া অমিয়া ফিরিয়া যাইবে কি না তাহাই ইতস্ততঃ করিতেছিল। সে তাহাদের আলোচনা শুনিতে পায় নাই। মীনার আহ্বানে ভিতরে আসিলে রণেন্দ্র একটুখানি হাসিল। সে হাসিতে উত্তাপ ছিল না—ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ছিল না। তৃপ্তির স্নিগ্ধ মধুর হাসি! অমিয়া যে তাহার সঙ্গ চাহিয়াছিল, তাহার অভাব অনুভব করিয়াছিল, ইহারই আনন্দ হয়ত সে হাসির ভিতর প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল। সে হাসিটুকু মীনার মনে অন্ততঃ এই অর্থ ই জানাইল। অমিয়ার হাতে একটি গোলাপ ফুল ছিল। ফুলটি খোকার কাছে ধরিয়া সে তাহাকে প্রলোভিত করিতেছিল।

মীনা সহসা পুরাতন প্রসঙ্গ তুলিয়া কহিল—"খোকার অসুখে তখন সব কথা চাপা পড়ে গিয়েছিল। সেদিন রাত্রে অমিয়া তোমাকে কি বিপদেই ফেলেছিল—আমি এখন কেবল সেই কথাই ভাব্‌চি। জলের উপর বেচারী যখন অজ্ঞান হয়ে পড়্‌ল, তখন তোমাকে আচ্ছা নাকালই হতে হয়েছিল ত? অবশ্য তোমার সঙ্গে অবস্থা বদল করতে পেলে তখন অনেকে হয় ত ভাগ্য মনে করতে পার্‌ত। কিন্তু আমাদের জাতটা যে দয়ারও যোগ্য নয় এই না তোমার ভাষ্য"?

মীনার এই অতর্কিত নিষ্ঠুর আক্রমণের জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না। রণেন্দ্র লজ্জিত ও অপ্রতিভের ভাবে অমিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল; তাহার মুখখানি ছাইয়ের মত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সে অনুতপ্তভাবে কহিল—"এ আপনার বাড়িয়ে বলা বৌঠাকরুণ! আমি ঠিক্ সে কথা বলিনি। যাঁরা আমাদের সাহায্য চান্—আমাদের সবল বাহু আনন্দের সঙ্গেই তাঁদের সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকে। কিন্তু যাঁদের মনের বল বেশী, আমাদের সাহায্য ত তাঁদের দরকার হয় না?"

কথা-শেষে সে আর একবার অমিয়ার দিকে চাহিল—মুখখানি ভাল দেখা গেল না। আলোর দিকে আড়াল করিয়া সে তখন খোকার জামার বোতামে গোলাপ-ফুলটি পরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল। খোকাও পরাইতে দিবে না, হাতে লইবে—সেও হাতে দিবে না, বোতামে লাগাইবে। কাজেই দুই জনে ছোটখাট একটু যুদ্ধ বাধিয়া উঠিয়াছে। মীনা কহিল—"এত ছেলেমানুষিও তোমার আসে ভাই! ঐ জন্যেই ত ছেলের মার চেয়ে ভাল হয়েচেন মাসী। কিন্তু ঠাকুরপো, তোমরা ফিলজফারের দল—ওর চুম্বকার্থ যাই বিশ্লেষণ করে বার ক'র, আমাদের সরল বাঙ্গলায় আমরা ত বুঝি—'যারে বলে চালভাজা

তারেই বলে মুড়ি'—কি বল ভাই অমিয়া?" বলিয়া সে অমিয়ার পানে হাসিয়া চাহিল।

"খোকার দুধ খাবার সময় যে পেরিয়ে গেল, ওর কি ক্ষিধেও নেই আজ?" বলিয়া অমিয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

রণেন্দ্রের নিষ্ঠুরতার আঘাতে সে যে কতখানি বেদনা পাইয়া গেল অথবা পাইল কি না, তাহা বোঝা গেল না। কিন্তু রণেন্দ্রের অনুতপ্ত মনের ব্যথা আত্ম-হৃদয়ে অনুভব করিয়া, তাহার বিষণ্ণ মুখের পানে চাহিয়া মীনার নিজের উপর রাগ ধরিতেছিল। এ সময় এ কথা না তুলিলেই ভাল ছিল! কিন্তু হাতের ঢিল একবার ছুড়িয়া মারিলে আর ত তাহাকে ফিরাইয়া লওয়া যায় না? প্রায় সমবয়সী এই দেবরটিকে সে যথার্থ ভালবাসিত। তাহার নারী-বিদ্বেষে তাই রাগ না করিয়া কৌতুকই অনুভব করিত। প্রাণতোষ বাবু ভাইয়ের বিবাহের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিলে সে নিরুদ্বিগ্নভাবে কহিত—"দরকার পড়্‌লেই মত বদ্‌লে যাবে—ভাইটি তোমার ভীষ্মদেব নন্ গো, সে ভয় নেই!" তাহার বিশ্বাস—মানুষ চিরদিন অবস্থার সহিত সন্ধি করিয়া চলিতে বাধ্য। প্রকৃতির নিকট পরাজয় স্বীকার করান' কেবল পাত্র নহে—স্থান ও কালের সাপেক্ষ। ইক্ষুদণ্ডকে পিষ্ট

করিয়া তাহার মিষ্ট রস বাহির করিতে গেলে তাহাকে ব্যথা দেওয়া যে অনিবার্য্য, কেবল এইটুকুই সে ভুলিয়া গিয়াছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অমিয়ার সঙ্কোচ

সেদিন বিকাল বেলায় বাহিরে বেড়াইতে যাইবার জন্য অমিয়া একটু সকাল সকাল প্রস্তুত হইয়াছিল। আজ সে একখানি ফুল্‌দার খয়ের-রঙের ঢাকাই-শাড়ী ও ঐ রঙেরই একটি ব্লাউজ্‌ পরিয়াছিল। কাণে দুটি মুক্তার দুল ও দু'একটি সৌখীন চুনীপান্নার সেফ্‌টিপিনও যথা স্থানে বিন্যস্ত হইয়াছিল। এখানে অপ্রয়োজন-বোধে কোন সৌখীন জিনিষেরই আবশ্যক হয় না। আজই যে কি এমন প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল—তাহা সে নিজেই বলিতে পারে। তাহার মনে যে একটা রঙিন নেশা—ধরিয়াছিল, তাহা কেবল পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনে নহে—কেশ-রচনাতেও অভিজ্ঞ চক্ষের প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়িয়াছিল।

বাগানের পথে বাহির হইতেই মীনার সহিত 'চোখা-চোখী' হইয়া গেল। দালানে মাদুর বিছাইয়া একরাশি বিচিত্র উপকরণ ছড়াইয়া মীনা তখন অভিনিবেশসহকারে চুল বাঁধিতেছিল। সিন্দুর-কৌটা, জলের ঘটি, চুলের দড়ি,

চিরুণী, আয়না প্রভৃতি লইয়া—দৌরাত্ম্য করিবার জন্য খোকাবাবু সেখানে উপস্থিত না থাকায়—কেশবন্ধনকারিণী পরম নিশ্চিন্ত মনে চুলে চিরুণী চালাইতে চালাইতে, উঠানে হামামদিস্তায় গরম-মশলা কুটিতে নিযুক্তা দাসীর সহিত গল্প করিতেছিল। অমিয়াকে প্রস্থানোদ্যতা দেখিয়া মীনা একটু-খানি দুষ্ট হাসি হাসিয়া কহিল—"আজ কার মন ভোলাতে এমন মোহিনী বেশ গো রাণী?"

অমিয়ার এ কথায় লজ্জা পাইবার বিশেষ হেতু না থাকিলেও, সে কিন্তু আকণ্ঠ লজ্জার রঙে রাঙিয়া বিজড়িত স্বরে কহিল—"মন-ভোলাবার মানুষ ত ভাই তোমায় ছাড়া আর কাকেও পেলাম না। সাধনা যদি সার্থক হয়ে থাকে, তা'হলে পরিশ্রম মিথ্যে হ'ল না তবু!"

"তাই নাকি! ভাগ্যবানের তপস্যার ফল—অভাগী আমি—বিনা তপস্যাতেই পেয়ে গেলাম তা'হলে?" বলিয়া আঁচলে চাবির গোছা হইতে একটি বিশেষ গঠনের চাবি বাছিয়া লইয়া সিন্দুরে ডুবাইয়া অমিয়ার শুভ্র ললাটতলে ক্ষুদ্র একটি বালারুণের ফোঁটা দিয়া, অকৃত্রিম মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া মীনা কহিল—"এমন কপালে উঠতে না পাওয়া যে সিঁদুরের অভাগ্য—ভাই! দেখ দেখি, এবার কেমন চমৎকার মানালো?"

অমিয়া তাহার মুগ্ধ দৃষ্টি হইতে মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া কহিল—"কোনো কোনো জানোয়ার আছে, যাদের আস্কারা দিলে মাথায় ওঠে। ছোঁয়াচে রোগের কাছ থেকে দূরে থাকাই ভাল—তাতে আর সংক্রমণের ভয় থাকে না। বুঝ্‌লে ?"

"ভয় ? বিবাহ-বিদ্বেষিণী নারী-সমিতির সহকারী-সম্পাদিকা, এবং পৃষ্ঠপোষিকা—'নারী-বিদ্রোহ' প্রণেত্রীর ভয় ? তুমি যে আমায় একেবারে অবাক্ করে দিলে ভাই অমিয়া ! সংক্রামক বীজের শক্তি ত তবে দেখ্‌চি অসাধারণ" বলিয়া কৃত্রিম বিস্ময়ে বিস্ফারিত-চক্ষে চাহিয়া চিন্তান্বিতভাবে পুনরায় কহিল—"ঐ জন্যেই ত ডাক্তারেরা বিধান দেন—টিকে নেবে। তাতে আর ছোঁয়াচের ভয় থাকে না।" কথা-শেষে গাম্ভীর্য্য ছাড়িয়া সে এবার প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিল।

অমিয়া মুখ ফিরাইয়া কি একটা কথা বলিতে গিয়া বলিল না। আত্মসম্বরণ করিয়া মীনার সহাস্য অনুরোধে আর একটি কথা শুনিয়া যাইবার আহ্বান উপেক্ষা করিয়াই সে কেবল বিলম্ব হইয়া যাইবার হেতু দেখাইয়া তাড়াতাড়ি বাগানের পথে বাহির হইয়া পড়িল।

মীনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির তলে দাঁড়াইয়া নিজেকে তাহার আজ যেন বড় দুর্ব্বল—বড় অসহায় মনে হইতেছিল। সে

যেন নিজের মধ্যে অপরাধীর কুণ্ঠা অনুভব করিতেছিল। বাগানে শীতের শেষে তখনও অজস্র শীত-ফুলের আমদানী চলিতেছিল। চন্দ্রমল্লিকার গাছগুলি পর্য্যাপ্ত পুষ্পালঙ্কারে ভূষিত হইয়া বর্ণে ও গন্ধে অমিয়ার পুষ্পলুব্ধ চিত্তকে মুগ্ধ ও আবিষ্ট করিয়া তুলিল। নিজের অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে সে বাগানের ভিতরেই আসিয়া দাঁড়াইল। এখানকার অনেক গাছই রণেন্দ্রের নিজ-হাতের যত্ন ও চেষ্টায় জন্মিয়াছে। ঐ যে ফুলভারনতাঙ্গী লতাটি সহকার অবলম্বনে দুলিয়া দুলিয়া নিজ সৌভাগ্য-গর্ব্ব প্রচার করিতেছে, উহার জন্ম-ইতিহাস মীনার মুখে অমিয়া শুনিয়া লইয়াছে। দেওর-ভাজে বাজি রাখিয়া তাহারা দুইটি লতাগাছ পুঁতিয়াছিল। মীনার গাছটি কোন্ সত্যযুগে মহাপ্রস্থান করিয়াছে, তাহার সাল তারিখ সে নিজেও স্মরণ রাখিতে পারে নাই। কিন্তু বাজি-হারার দণ্ডস্বরূপ প্রতিদ্বন্দ্বীর গাছটিতে জলসেচন করিয়া আসিতেছে যে কতদিন, তাহার হিসাব হয়ত তাহার ডায়েরীর পাতা খুঁজিলে এখনও মিলিতে পারে।

রণেন্দ্রের কক্ষের বাতায়ন রুদ্ধ। তাঁহার বা খোকার কথার শব্দ বা হাসির সুর বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল না। রুদ্ধদ্বার জানালাটির পানে চাহিয়া চাহিয়া অমিয়ার ইচ্ছা হইতেছিল, সেখানকার অধিবাসীদের কোন একটু খবর

জানিয়া লয়। খোকাটি এমন অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িল নাকি? নহিলে এমন নিঃশব্দ অবস্থা ঘটিতে দেওয়া ত তাহার দ্বারা অকারণে সম্ভব নয়। রণেন্দ্র এখন কি করিতেছেন কে জানে? এ সময় ঘরের জানালাগুলি আঁটিয়া দিয়া চুপ-চাপ শুইয়া আছেন না কি? না—নিশ্চয়ই বেড়াইতে গিয়াছেন। আচ্ছা, এই অবসরে অমিয়া যদি একবার উহার ঘরখানায় ঘুরিয়া আসে, তাহাতে দোষ হয় কি? কেহই ত এখন এদিকে আসিবে না। অমিয়া কোথা—সে সম্বন্ধে কোন সংবাদও ত লইবে না। সকলেই জানে—সে এ সময় বেড়াইতে যায়। অমিয়ার মনে সুমতি ও কুমতির দ্বন্দ্ব বাধিল। সুমতি কহিল—"মালিকের অনুপস্থিতিকালে তাঁহার বিনানুমতিতে অনধিকার-প্রবেশে তোমার আবশ্যকই বা কি?"

কুমতি জবাব দিল—"প্রয়োজন এমন গভীর কিছু নয়, কেবল ঘরখানি একবার দেখিয়া শুনিয়া ঘুরিয়া আশা মাত্র।"

সুমতি কহিল—"চুরি করিবে নাকি? প্রয়োজন যদি নাই, তবে পরের ঘরেই বা ঘুরিতে যাওয়া কেন?"

কুমতি কহিল—"চুরির মতলবেই কি ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের ঘরে যায়? পড়িবার মত কোন বই টই যদি

থাকে—দুই একখানা দেখিয়া শুনিয়া নির্ব্বাচন করিয়া রাখিয়া আসাও ত চলিতে পারে ?”

সুমতি কহিল—“বেশ ত ! তাহা সাম্‌না-সাম্‌নি চাহিয়া লইলেও ত পার—এজন্য অপরাধীর মত এত গোপনতার আশ্রয় গ্রহণ করা কেন ?”

কুমতি রাগ করিয়া কহিল—“সে আমার খুসী ! এত শত কথার জবাব দিতে আমি কাহারও বাধ্য নহি।”

সুমতি তাহার পথানুসরণে কহিল—“তবে মর !”

যতক্ষণ মনের মধ্যে সুমতি ও কুমতির দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, সে সময় অমিয়া বাগানে ঘুরিয়া বাছা বাছা—ফুল দিয়া একটি সুন্দর তোড়া তৈয়ারি করিতে নিযুক্ত ছিল। সাদা ও হলুদ রঙের চন্দ্র-মল্লিকার মাঝখানে একটি সবুজ পাতার বেষ্টনীর মাঝে বৃহৎ মন্টিক্রষ্টো গোলাপ দিয়া সে তোড়াটিকে সাজাইয়াছিল। গোলাপটি উজ্জ্বল ও মসৃণ। উহার রক্তবর্ণ তাহার দৃষ্টিকে শুধু আকৃষ্ট নহে, মুগ্ধও করিতে ছিল। পুষ্পগুচ্ছটি হাতে করিয়া অমিয়া নিজে তৃপ্ত হইতেছিল না। ভাল জিনিষটি নিজে ভোগ করিয়া তৃপ্ত হয় না—তাহা ভালবাসার পাত্রকে দিতেই সাধ যায়। অমিয়া স্থির করিল, বাড়ী ফিরিয়া এটি সে মীনাকেই উপহার দিবে। মীনা আজকাল যেন কেমন হেঁয়ালীর ভাসায় কথা কহিতে সুরু

করিয়াছে। সে কি অমিয়ার সম্বন্ধে মনে মনে কোন মিথ্যা ধারণা পোষণ করিতেছে নাকি? এটা ত ভাল নয়! অনেক সময় চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার তামাসা সহ্য করায় হয়ত সেই উহাকে এ ভাবের প্রশ্রয় দিয়াছে। এখন হইতে একটু সতর্কভাবে চলিতে হইবে ত! ছিঃ—হাসি-তামাসার কথা কোন্ দিন সত্যের ছদ্মবেশে কোন অনীপ্সিত স্থলে গিয়া হাজির হইবে বলা ত যায় না কিছু—লোকে শুনিলে ভাবিবে কি? অমিয়ার যে তাহা অপেক্ষা মরণও ভাল ছিল। নাঃ—মীনাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া কিছুতেই চলিতেছে না।

মালী কহিল—ছোটবাবু বাড়ী নাই, তিনি ষ্টেশনের দিকে গিয়েছেন। খোকাকে সে এইমাত্র বাড়ীর ভিতর দিয়া আসিল। অমিয়া এ অনুকুল উত্তর আনন্দের সহিতই গ্রহণ করিল।

বাগানের দিকের জানালাগুলি বন্ধ থাকিলেও, ঘরের সাম্‌নের দরজাটি খোলাই ছিল। রণেন্দ্র বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন এ সংবাদও সে পাইয়াছে। তবু ঘরে ঢুকিতে সঙ্কোচ যেন কাটিতেছিল না। রণেন্দ্র আসিবার পর এ ঘরগুলিতে সে একদিনও আসে নাই। আজও মনে হইতেছিল—ফিরিয়া যায়। তাহার বুকের ভিতর ঢিপ্

টিপ্ করিতেছিল। ঠোঁট শুকাইয়া উঠিতেছিল। চোর যেন চুরি করিতে আসিয়াছে। এই বিচলিত ভাবে সে নিজেই নিজের মনে বিস্ময় বোধ করিল। সংসারকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়া দর্পভরে অবলীলায় যে চিরদিন চলিয়াছে, আজ তাহার সারা অঙ্গ জুড়িয়া এ কি দুর্ব্বহ জড়তার আবির্ভাব? সে ত কোন অসদভিপ্রায়ে এখানে আসে নাই! অন্যায় কার্য্যও ত করে নাই কিছু। তবে কেন এ লজ্জা? কিসের জন্যই বা এত সঙ্কোচ?

ঘরে কেহ ছিল না। বিছানায় ছেঁড়া কাগজের স্তূপ—ঘরের মেঝেয় ফুলের পাপড়ি ছড়ান। জুতার একটি পাটি, সাবানের কেস্, কাঠের বল, চুল আঁচড়ান ব্রাস্ এখানে সেখানে ছড়ান থাকিয়া খোকাবাবুর অনতিপূর্ব্বের অবস্থানের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল। টেবিলের উপর বহিগুলির অবস্থা এতখানি শোচনীয় না হইলেও, সেখানেও তাহার অল্পস্বল্প বিপ্লব সংবাদ প্রচার করিতেছিল। অমিয়া খালি ফুলদানীতে ফুলের তোড়াটি রাখিয়া দিয়া, প্রথমেই মনে করিল ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে ঘরখানির একটু সংস্কার করিয়া দিয়া যাইবে। বেচারী নারীদ্বেষীর সৌন্দর্য্যবোধ বড় অল্প—খাটের উপর কোট, টেবিলের একাংশে উড়ানী? এ সব গুছাইয়া রাখা যাহার সাধ্য নাই—সে আবার”—যাক্।

ঘরে দিনের আলো ম্লান হইয়া আসিয়াছিল। অমিয়া বাগানের দিকের জানালা দুটি খুলিয়া দিতেই প্রচুর ফুলের গন্ধ বহন করিয়া এক ঝাপ্‌টা আলো ও বাতাস তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল; এবং মুহূর্ত্তে তাহার দ্বিধাক্ষিন্ন মনটিকে তৃপ্তির প্রসন্নতায় ভরাইয়া দিল। টেবিলের উপর পাতা-খোলা যে বইখানি উল্‌টান অবস্থায় পড়িয়াছিল, সেইখানি তুলিয়া লইয়া সে প্রথমে খোলা-অংশে চোক বুলাইয়া রণেন্দ্রের পাঠ্য স্থানটুকু দেখিয়া লইল। ঘরে ঢুকিবার সময় তাহার ইচ্ছা ছিল, ঘরখানি একটু দেখিয়া শুনিয়া এটা সেটা নাড়িয়া একটু বা গুছাইয়া দিয়া এমনি সন্তর্পণেই সে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিল না। কোন্ সময় সেই খোলা বইখানির প্রতি তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা অতিক্রম করিয়া চলিতেছিল, তাহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত আলোর অভাব না ঘটিয়াছিল—সেও বুঝিতে পারে নাই। ছাপার অক্ষর ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া যখন আলোর অভাব অনুভূত হইল—পুস্তক পৃষ্ঠা হইতে আগ্রহ-ব্যাকুল চোখের দৃষ্টি উঠাইয়া ঘাড় ফিরাইতে গিয়াই সে দেখিল, দুই হাতে খানকয়েক পুস্তক লইয়া রণেন্দ্র খুসী-মনে ঘরে ঢুকিতে গিয়া, সহসা বাধাপ্রাপ্তের ন্যায় থমকিয়া বাহিরেই দাঁড়াইয়া পড়িল।

তাহার চোখের তারায় বিপুল বিস্ময়ের চিহ্ন ঘন হইয়া ফুটিয়া উঠিল। অন্যমনস্কতায় তাহার জুতার শব্দ পর্য্যন্ত অনুভব করিতে না পারায়, লজ্জা ও সঙ্কোচে বিপন্ন বিব্রত ভাবে অমিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কৈফিয়ৎস্বরূপ সে কেবল একটুখানি ম্লানহাসি হাসিল। রণেন্দ্র কিন্তু তাহার আকস্মিক আগমনের কোন কৈফিয়ৎ চাহিল না। সঙ্কোচ কাটাইয়া অত্যন্ত সহজভাবেই সে ঘরে ঢুকিল। হাতের বই ক'খানি টেবিলের উপর রাখিয়া হাসিমুখে কহিল—"বইগুলো আজকের ডাকে এসে পৌঁছেছে। একটি বন্ধু উপহার পাঠিয়েছেন। ডাকঘরে বসেই প্যাক্ ট্যাক্ খুলে এদের উদ্ধার ক'রে নিয়ে এলাম!"

অমিয়া বই ক'খানির পানে একবার চাহিয়া দেখিল—তখনও সে আত্মস্থ হইতে না পারায়, কোন উত্তর দিল না। রণেন্দ্র তাহার সঙ্কোচ দেখিয়া নিজেই কথা কহিল—"অন্ধকারেই বুঝি পড়্‌ছিলেন? কি আশ্চর্য্য! বাতিটা জ্বেলে নেন্ নি কেন?" বলিয়া টেবিলস্থিত বাতি ও দেশালাই লইয়া সে আলো জ্বালিয়া দিয়া কহিল—"বোম্বাই থেকে এখনি টেলিগ্রাফ এল, শীঘ্রই আমায় যেতে হবে সেখানে। আপনি এখনো কিছুদিন এখানে থাক্‌চেন বোধ হয়"?

আর চুপ করিয়া থাকা ভাল দেখায় না। তা ছাড়া—রণেন্দ্রের ঐ একটি মাত্র সংবাদে অমিয়ার মনের মধ্যে অনেক ভাবের তরঙ্গ বহিয়া গেল। সে হাসিমুখে তাহার সৌভাগ্যে আনন্দ জানাইতে গিয়া—উদ্গত দীর্ঘশ্বাসটাকে চাপিয়া ফেলিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দোটানায়

সে রাত্রে অমিয়ার একটুও সুনিদ্রা হইল না। বিছানার মধ্যে অন্ধকারের আশ্রয়ে রণেন্দ্রের সহাস্য উজ্জ্বল মুখচ্ছবি কেবলি থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনোদর্পণে ভাসিয়া উঠিতেছিল। আজ বিদায়ক্ষণের সেই সুগভীর স্নেহভরা দৃষ্টি; সে দৃষ্টিতে সে কি দেখিয়াছিল তাহা যেন অনুভবের অতীত বলিয়াই তাহার মনে হইতেছিল। পৌঁছাইয়া দিবার জন্য তিনি বাগান পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়াছিলেন, অমিয়া তখন লজ্জায় মানা করিতে পারে নাই। কিন্তু এখন মনে হইতেছিল 'প্রয়োজন নাই' বলিলেই বোধ হয় ভাল হইত। বিদায়কালে কেনই বা আর এ ভদ্রতার আদান-প্রদান! রণেন্দ্র তাঁহার নূতন কার্য্যক্ষেত্র বোম্বাই চলিয়া যাইবেন; হয় ত অমিয়ার জীবন-পথে তাঁহার ছায়াটিও আর কখনো পতিত হইবে না। তাহার কথা হয় ত তিনি চিরদিনের জন্যই ভুলিয়া যাইবেন। কেনই বা তা না যাইবেন? পথের এ দু'দিনের পরিচয়—কিসের

বলে চিরদিনের স্মৃতিতে তাহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে? নির্ব্বোধের ন্যায় সেই বা এমন আশাকে প্রশ্রয় দিবে কেন?

অমিয়া মনে করিতে চাহিল রণেন্দ্র তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ চিন্তায় সে সুখী হইতে পারিল না। তাহার মনে পড়িল—এমন একটা জিনিষ সে আজ রণেন্দ্রের জন্য রাখিয়া আসিয়াছে, যাহা কিছুতেই তাহার করা উচিত ছিল না। অবশ্য ভ্রমক্রমেই এটা ঘটিয়া গিয়াছে। মীনার জন্য আহরিত ফুলের তোড়াটি সে রণেন্দ্রের ফুলদানীতে সাজাইয়া দিয়া আসিয়াছে। তাহার এ অনিচ্ছাকৃত দানের খবর ত তিনি বুঝিতে পারিবেন না! হয়ত মনে করিবেন, সে উপযাচিকা হইয়া তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্যই সেটি দিতে গিয়াছিল। ছিঃ ছি—কি ভোলা মন তাহার! তবু সেই আত্মধিক্কারের মধ্যে আত্মতৃপ্তির একটুখানি গোপন-আনন্দ সে মনের কাছে যেন লুকাইতে চেষ্টা করিতেছিল। আচ্ছা, ফুলটা তিনি যখন দেখিতে পাইবেন—কি ভাবে গ্রহণ করিবেন? খুসী হইবেন? তিনি পুষ্পভক্ত—খুসী হইবেন নিশ্চয়। ফুলটা ফুলদানীতেই থাকিবে বোধ হয়, অথবা—আচ্ছা, যদি মনে করেন সেটা মালীরাই রাখিয়া গিয়াছে? আঃ! তাহা হইলে ত বাঁচা যায়। কিন্তু এ কি! এ সব কথা সে কেন ভাবিয়া মরিতেছে? এ ত তাহার চিন্তার

বিষয় নহে! স্বাস্থ্যের উন্নতি-কামনায় আসিয়া সে কি তবে আত্মার অবনতি করিয়া বসিল না কি? এ ত তাহার গন্তব্য-পথ নহে? দিগ্‌ভ্রান্তের ন্যায় সে এ কি অজানা রহস্যময় অপরিচিত অনভিপ্রেত পথে যাত্রা সুরু করিয়া দিল?

অমিয়া ভাবিয়া দেখিল, মানুষের এই যে দুর্ব্বলতা, লোকে যাহাকে বলে প্রেম, ইহাকে সে চিরদিন ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে। সৃষ্টির আদিকাল হইতে নর এবং নারীর এই যে আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ বিরহ ও মিলন—ইহার বিবরণ সে কাব্যে উপন্যাসে যথেষ্টই পাঠ করিয়াছে। সংসারী-জীবনে ইহার গতি লক্ষ্যও করিয়াছে। এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া, বিচার করিয়া, বহু গবেষণার ফলে একটা সিদ্ধান্তও সে করিয়া রাখিয়াছে—কেবল ইহার প্রয়োজনীয়তা বা সার্থকতাই স্বীকার করে নাই। সে জানিত, এগুলি কাব্য উপন্যাসের রমণীয় উপাদান হইলেও, বাস্তব-জীবনে অপ্রয়োজনীয়। শুধু অপ্রয়োজনীয় নহে—ত্যাজ্য। অত্যন্ত দুর্ব্বলচিত্ত সাধারণ নর-নারীদেরই ইহা নিজস্ব। সে কি আজ জানিয়া শুনিয়া অন্ধের মত, অজ্ঞের মত তাহার জীবন-নদীর গতি সেই ফেনিল ঘূর্ণ্যাবর্ত্তের মধ্যেই তবে মিশাইতে চলিয়াছে না কি? সে ত ইহা কোনও দিন

কামনা করে নাই! তবে এমন ভ্রম করিল কেন? সত্যই কি সে তবে রণেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছে? ছিঃ ছিঃ কি নির্লজ্জ সে! রণেন্দ্র তাহার কে? আত্মীয়, বন্ধু—এমন কি—এক পথের বা মতের যাত্রী পর্য্যন্ত নহেন তিনি। ইঁহাকেই সে কি না ভালবাসিল! ডুবিয়া মরিবার দড়ি কলসীও কি তাহার জুটিল না?

মনোভাবের এই অস্পষ্ট ইঙ্গিতে অমিয়া নিজেকে সহস্রবার ধিক্কার দিল। নিজ অপরাধের সে যেন সীমা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। কেন সে তাহার নির্জ্জন মনোদুর্গে রণেন্দ্রকে প্রবেশের অনুমতি দিয়াছিল? দিয়াছিল ত সতর্ক থাকে নাই কেন? সে যখন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিতে চাহিয়াছিল, তখন ত ভাবিয়া দেখে নাই যে, পরাজয়েই সে জয়ী হইয়া বসিবে।

অন্ধকারে সে তাহার প্রবাসিনী মাসীমার মুখখানি মনে করিতে চেষ্টা করিল। দেখিল—এই তিন মাসের ব্যবধানে সে মুখের ছবি যেন অনেকখানি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেই অস্পষ্ট ছবিখানার পশ্চাতে এ কার উজ্জ্বল মূর্ত্তি—সহাস্য স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে? এ মুখে বিরক্তি বিদ্বেষের চিহ্ন কোথায়? এ চক্ষু যেন বলিতেছে—পৃথিবী কেবল ভালবাসিবার স্থান। কিন্তু ইহার চিন্তাকেও

সে আর মনের মধ্যে প্রশ্রয় দিবে না ত—কিছুতে, কোন মতে না!

অমিয়া বিছানার উপর বসিয়া প্রার্থনার ভাবে মনে মনে কহিল—"আমার কর্ত্তব্য, আমার প্রার্থনা, আমি যেন ভুলিয়া না যাই। হে ভগবান! স্বর্ণমৃগের প্রলোভনে ভুলিয়া আমার মন যেন দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া না পড়ে। হে প্রভু, আমায় বল দাও!"

প্রার্থনা শেষে সে যেন অনেকখানি শান্তি অনুভব করিল। তবু অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতে তাহার চোখের জল ঝরিয়া পড়িল। মনে হইল—কর্ত্তব্যের কাছে সে যেন তাহার অনেক কিছুই বলি দিল।

ভোরের দিকে ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখিল। দেখিল, জাহাজে চড়িয়া রণেন্দ্র যেন কোথায় চলিয়া যাইতেছেন, সে যেন বিদায় দিতে গিয়াছে। রণেন্দ্র তাহার অভ্যস্ত মিষ্ট হাসির সহিত চোখের জল মিশাইয়া যেন বলিতেছেন— "বিদায়—বন্ধু—বিদায় তোমার কাছে চিরদিনের জন্যই বিদায়।" জল কাটিয়া সফেন তরঙ্গদল দলিত করিয়া ক্রমেই যেন জাহাজখানি অস্পষ্ট হইতে হইতে দিগন্তে মিশাইয়া গেল। কেবল কাণে বাজিতে লাগিল—রণেন্দ্রর সেই অশ্রুজড়িত হাসিমাখা কণ্ঠের ধ্বনি "বিদায়—বিদায়!"

ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ মেলিয়া তাকাইয়া সে দেখিল, খোলা খড়খড়ির ফাঁকে ফাঁকে রোদের আলো আসিয়া ঘর ভরাইয়া দিয়াছে। বাহিরে সকাল-বেলার পাখীর গান থামিয়া গিয়া কৃষাণ-বালকের বেসুরা গানের মিঠে আওয়াজের সহিত গরুর গাড়ীর শব্দ হাটের দিন জানাইয়া দিতেছে। অমিয়া হাত দিয়া দেখিল, মাথার বালিসটা তাহার চোখের জলে ভিজিয়া গিয়াছে।

সে লজ্জিতমুখে তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। দিনের আলো ও বাতাস, রাত্রের দুর্ব্বলতা-গুলাকে স্বপ্নের মত ভুলাইয়া দেয়। লঘুচিত্তে সে ঘরের বাহির হইল। মনে করিল, রণেন্দ্রকে ভয় করিবার তাহার কোনই প্রয়োজন নাই। তিনি যখন দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন, আর সেও যখন এ দেশের অধিবাসী নহে, তখন যে দু'দিন একসঙ্গে রহিয়াছে, ভদ্রতার আদানপ্রদানে ক্ষতিই বা কি এমন? যাঁহার দয়ায় অপমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইল, তাঁহাকে বন্ধু মনে না করিলে অকৃতজ্ঞ হইতে হয় যে! মানুষের পরস্পরের সহিত সন্ধি করিয়া চলাই ভাল—বিদ্রোহ বিবাদের প্রয়োজনই বা কি? দুর্ভাগ্য দেশে সাম্প্রদায়িক দলাদলির ত অভাব নাই। ইহার উপর আর নূতন দল সৃষ্টি করায় লাভই বা কি এমন? তাহাদের

সভার এবারকার অধিবেশনে "পুরুষদের সহিত সম অধিকার" সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশে এবার একটু আধটু মনে হইল—পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন হইবে—অমিয়া মনে মনে ইহার একটা খস্‌ড়াও করিয়া রাখিল।

সে রাত্রিটি রণেন্দ্রের কি ভাবে কাটিয়াছিল, আমরা তাহার সঠিক বিবরণ অবগত নহি—মানুষটি ভারি চাপা কি না। তবে অমিয়ার পরিত্যক্ত পুষ্পগুচ্ছটি যে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার বিছানায় থাকিয়া পুনরায় ফুলদানিতে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, তাহার বিশ্বস্ত প্রমাণ আমরা পাইয়াছি; তা ছাড়া আরও একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। অমিয়ার বিদায়ের দিন নিকটবর্ত্তী হইলে, মীনার নিভৃত প্রশ্নে আকর্ণলজ্জায় রাঙ্গা হইয়া সে এমন কোন কথা স্বীকার করিয়াছিল, যাহা শুনিয়া মীনা বলিয়াছিল, পৃথিবীতে এত-বড় আশ্চর্য্য ঘটনা যে ঘটিতে পারে, ইতঃপূর্ব্বে তাহার সে ধারণাও ছিল না! সে কথা যথা-সময়ে প্রকাশ পাইবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মীনার দৌত্য

অমিয়ার এইবার বাড়ী ফিরিবার সময় আসিল। সত্যবতী দেশে ফিরিয়াছেন। বাড়ী যাইবার পূর্ব্বরাত্রে মীনা তাহাকে নিরালায় পাইয়া সঙ্কোচ কাটাইয়া কহিল—"কাল ত সকালেই চলে যাবে ভাই, একটি ভিক্ষা দিয়ে যাবে? ভিখারীকে বিমুখ করা কিন্তু শাস্ত্র এবং মনুষ্যত্ব বিগর্হিত—অর্থাৎ কিনা ভয়ানক পাপ!"

তাহার বলার ধরণে অমিয়া সন্দিগ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু মুখে সে ভাব প্রকাশ পাইতে না দিয়া হাসিয়া কহিল—"তোমায় অদেয় আমার কিছুই ত নেই ভাই, প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়ে বসে আছি যে, বক্তব্যটা কি শুনি?"

মীনা হাসিল। কহিল—"ঐখানেই ত মুস্কিল বাধালে ভাই! আমি ত প্রাণের ব্যবসায়ী নই। যা পেয়েচি তাই সাম্‌লাতে পারি না। মাল বাড়িয়ে আর কর্‌ব কি? তোমার প্রাণ আমি ফিরিয়ে দিলাম। আমি শুধু—

উকীল!" বলিয়া সে সখীর ট্রাঙ্ক গোছানর কাজে সহায়তা করিতে লাগিল।

লজ্জিত ভাবটা গোপন করিবার অভিপ্রায়ে, কাজের ছুতায় ভাঁজ করা শাড়ীর ভাঁজ খুলিয়া পুনরায় ভাঁজ করিতে করিতে অমিয়া কহিল—"ওঃ! তা হ'লে 'ফি' পেয়েচ বল! আমি বলি ব্যাগার। ভিক্ষে নয় তা হ'লে!"

"না ভাই, ফি পাইনি এখনও, ধারে—ওকি গরম কাপড়গুলো সবই যে ভ'রে ফেল্লে? শালখানা আর রাগ্‌টা বাইরে থাক্, ট্রেণে দরকার হবে ত" বলিয়া সে ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলে, অমিয়া মুখ নীচু রাখিয়া ট্রাঙ্কে জিনিষ ভরিতে ভরিতে হাসিয়া কহিল—"তারপর, কাণ্ডটা কি কর্‌তে হবে শুনি? প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে শেষ যেন দাতাকর্ণের দুরবস্থা করে ছেড় না।"

"নিশ্চয়ই না। আমায় কি তুমি এমনি অকৃতজ্ঞই ঠাওরালে শেষে? মা ভৈঃ!"

"তবে আমিও বরপ্রদা হ'লাম। বল কি কর্‌তে হবে—রণে বনে বাণিজ্যে ব্যসনে সহমরণে—কিসে তুমি আমার সাহায্য বা সঙ্গ চাও?" বলিয়া হাসিমুখে মুখ তুলিতেই মীনা তাহার ডান হাতখানা নিজ দুই করতলে চাপিয়া ধরিয়া কহিল—"বুঝ্‌তে তুমি ঠিক্ পেরেচ অমিয়া!

তার কারণ, বিধাতা তোমায় নির্ব্বোধ করেন নি। তোমার মাসীমাকে রাজী কর্‌বার ভার আমার। মিস্ চৌধুরী—আমার মাসীমা—লিখেছেন, তিনি নিজে গিয়ে তাঁর সম্মতি আদায় করে নেবেন। শুধু তুমি বল ঠাকুরপোকে তুমি অযোগ্য মনে কর্‌ছ না—তাঁর ভালবাসাকে ভালবেসেই তুমি নিতে পার্‌বে ?”

অমিয়া গলা ঝাড়িয়া মৃদুস্বরে বলিল—“আমায় তুমি মাপ কর ভাই মীনা। সত্যিই আমি এ দিক্ দিয়ে ভেবে দেখিনি। যদি রাখ্‌বার কথা হত”—বলিয়া কথা শেষ না করিয়া সে যেন নিজের সহিত বোঝাপড়া করিয়া লইবার জন্য মীনার হাত ছাড়াইয়া পুনরায় কাজে মন দিল। কাজ তাহাতে বিশৃঙ্খলই হইতে লাগিল। মীনা তাহার হাতের কাপড়গুলি টানিয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল—“ভীষ্মদেবের প্রতিজ্ঞাই যদি ভাঙ্গলে—তাঁকে সুখী হবারও সুযোগ দাও। সত্যি বল্‌চি আমি, তুমি ঠক্‌বে না—যখন তাঁকে ভাল করে চেন্‌বার অবসর পাবে, দেখ্‌বে ভালবাসার শক্তি তাঁর কত বিস্তৃত। বাড়িয়ে বল্‌চি ভেবো না। আমি যে তাঁকে কম বয়স থেকে বন্ধুভাবে দেখে আস্‌চি। আমার চেয়ে ত কেউ বেশী চিন্‌বে না ? বল তুমি মত দিলে, বল বল—”

মীনার আদরের বেষ্টন হইতে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া মৃদু জড়িত স্বরে অমিয়া কহিল—"কিন্তু তুমিও ত জান মীনা, আমার জীবনের যা ব্রত? এ আমি ব্রত হিসাবেই গ্রহণ করেচি। আমার সংকল্পে বাধা দিও না। আমায় মাপ কর।"

"জানি বৈকি, জানি বলেই ত বল্‌চি। ব্রত কি চিরদিনই কর্‌বে নাকি? এবার উদ্‌যাপনের পালা। স্বয়ং ভগবান যখন বরদাতা হয়ে মিলন চাইচেন, তখন ফেরাতে ত তুমি পার্‌বে না ভাই? না—কোন কথা নয়। প্রকৃতিও যে পুরুষের দাসী। আধখানা দিয়ে সত্যিকার কোন কাজ কি হ'তে পারে কখনও? যে রত্ন তোমায় দেব, জেনো তা অমূল্য। দাসী হ'তে না চাও—দেবীই হোয়ো, কিন্তু হেলায় হারিও না। এটি আমার অনুরোধ নয়—মিনতি। আমি বল্‌চি তোমার জীবন সার্থক হবে, সুখের হবে। বাইরের উচ্ছ্বাস নেই দেখে তুমি তাঁকে ভুল বুঝ না। এ আমার নয়, আবেদন যাঁর, উত্তর তাঁকেই দিও—বুঝে দিও। বল, মাসীমা রাজি হ'লে তুমি অসম্মত নও"—বলিয়া সে সাদরে অমিয়াকে জড়াইয়া ধরিল।

মীনার আলিঙ্গন-পাশ হইতে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া সে কেবল নত হইয়া তাহার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল।

বয়সে সামান্য কিছু ছোট হইলেও, এপর্য্যন্ত সে মীনাকে কোনদিন প্রণাম করে নাই। আজ প্রণাম করিয়া, তাহার দেওয়া সম্বন্ধের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইল কি না বুঝা গেল না। কেবল হাসিয়া কহিল—"ফিরে গিয়ে ঘটক-আফিসে তোমার ঠিকানাটা পাঠিয়ে দেব আগেই। ঘট-কালিটি বেশ শিখেচ দেখ্‌চি। পেশাদার ঘটকদের চাইতেও বেশী। এক্ষেত্রে কিন্তু ওটা কেঁচে গেল। বুঝ্‌লে?"

"বুঝেছি"—আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাসটা অনেকখানি অমিয়াকে আদর করিয়া শমিত করিয়া লইয়া মীনা হাসি-মুখে কহিল—"এবারকার কাজটা কিন্তু ভাগে, বাহাদুরি সবখানিই আমার প্রাপ্য নয়। এ কথা অস্বীকার না কল্লে প্রত্যবায়ভাগী হ'তে হবে। বিদায়টা কিন্তু নগদে চাই—ধারে কারবার আর কর্‌ব না। তুমি বাক্স গোছাও, আমি ততক্ষণ ওদিকের ঘরটা একবার দৌড়ে ঘুরে আসি ভাই"—বলিয়া হাসিয়া সে ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। আকণ্ঠ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া, বিপন্ন বিব্রতভাবে অমিয়া তাহাকে কাজের ছুতায় আট্‌কাইবার চেষ্টা করিয়াও সফল হইল না। সে কেবল মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া কহিল—"শুধু ঘট্‌কালী নয় ভাই, ডাক্তারিও যে শিখ্‌চি এখন। রোগীর অবস্থা যে রকম কাহিল দেখে এসেচি, তাতে দেরী

করে শেষে কি মানুষ খুনের মাম্‌লায় পড়্‌ব ? রাগ কোর না ভাই, আমি এর পর সারাক্ষণটাই তোমার কাছে কাটাব। মানুষের মনটা ভারী বদ্‌। যেমন দুর্ব্বল, তেম্‌নি চঞ্চল, শুভবুদ্ধিকে তাই চট্‌ করে বেঁধে ফেলাই সদ্‌যুক্তি।"

অমিয়ার মুখের পানে চাহিয়া তাহার মনের দোলায়িত অবস্থাটি বুঝিয়া লইতে বুদ্ধিমতী মীনার বিলম্ব হয় নাই। সে তাই বিষয়টিকে পাকা করিয়া ফেলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এ ভার সে রণেন্দ্রকে লইতে দিতে সাহস করে নাই—পাছে সে আনাড়ীর মত আরম্ভেই খেলা কাঁচাইয়া বসে! সে বেচারী যখন হার মানিয়াই লইয়াছে, তখন তাহাকে লইয়া আর খেলাইয়া ফল কি ? একেই ত দেশ ছাড়িয়া সে তাহার নূতন ব্যবসায়ের কার্য্যে বিদেশে যাইতেছে, কেবল মীনার কাছে কোন গোপন আশার আশ্বাসবাণী পাইয়াই না যাওয়া স্থগিত রাখিয়াছে। এ সময় তাহার মানসিক গোলযোগের কালে আর অকারণ ভাবনা বাড়াইয়া দুঃখ দিয়া লাভ কি ? স্নেহপাত্রকে প্রকৃত দুঃখ পাইতে দেখিলে নিজেও যে সুখী হওয়া যায় না, মীনা তাহা ভালই বুঝে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

প্রকৃতির পরিবর্ত্তন

বাড়ী ফিরিয়া অমিয়া সবচেয়ে বিস্মিত হইল মাসীমাকে দেখিয়া। তাঁহার কৃশ দেহের বাহ্যিক পরিবর্ত্তন বড় বেশী সংসাধিত না হইলেও, সমস্ত শরীর দিয়া যেন নির্ম্মল আনন্দের একটি স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছিল। কথায় হাসিতে দৃষ্টিপাতে একটি শান্ত সমাহিত ভাব। সংসার-বিদ্রোহীর বিদ্রোহভরা চিত্তের জ্বালাময় তীব্রতার লেশ মাত্র তাহাতে বর্ত্তমান ছিল না। সাবিত্রী দেবীর চরণস্পর্শিত সিন্দুর-কৌটা ও লোহাগাছি অমিয়ার হাতে দিয়া কহিলেন—"এ দু'টি আমি তোমার জন্যেই এনেছি। যত্ন করে তুলে রাখ।"

অমিয়া হাসিয়া কি একটা তামাসার কথা বলিতে গিয়া, তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কিছু না বলিয়াই হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল।

পূজার ঘরেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য দেখা যাইতেছিল। আলিপনা চিত্রিত কাঠের ছোট চৌকিখানির উপর কাশী হইতে আনীত উজ্জ্বল পিতলের সিংহাসনে পুষ্পমাল্যে

বেষ্টিত চন্দন-চর্চ্চিত হইয়া শোভা পাইতেছিল—তাহার মৃত মেসো মহাশয়—সত্যবতীর স্বামীর চির-অনাদৃত, চির-অবহেলিত অস্পষ্টপ্রায় ফটোখানি। এখানি বরাবর বাহিরে বৈঠকখানার দেওয়ালে টাঙ্গান থাকিত। ত্রিপুরাচরণের মৃত্যুর পর হইতে ছবিখানি অযত্নে মলিন অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। সত্যবতী কখনও ইহার প্রতি যত্ন লওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই। পূর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্তার্থেই অপরাধিনী যেন ক্ষমার আবেদন লইয়া এখন পূজাকালে অনেক সময় ধ্যানমগ্ন হইয়া ইহারই সম্মুখে বসিয়া থাকেন। ভূমে লুটাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করেন। আর একখানি চৌকির উপর একজন সৌম্য শান্ত মহাপুরুষের তৈলচিত্র সজ্জিত—ইনি বানপ্রস্থাবলম্বী, সংসারত্যাগী, সত্যবতীর গুরুদেব। ইঁহার নিকটে মন্ত্র লইয়া উপদেশ পাইয়া সত্যবতী নিজের ব্যর্থ জীবনে সার্থকতা অনুভব করিতে শিখিয়াছেন। আজকাল পূজা-শেষে তিনি যখন বাহিরে আসেন, অমিয়ার মনে হয় একটি স্বর্গীয় শান্তিপূর্ণ ভাব-জ্যোতিঃতে যেন তাঁহার মুখখানি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

মিস্ চৌধুরীর আবেদন পাইবার পূর্ব্বে হইতেই অমিয়ারই চিঠিতে সত্যবতী রণেন্দ্রের খবর কিছু কিছু

জানিয়াছিলেন। এই ছেলেটির কথা অমিয়া তাঁহাকে প্রথম প্রথম চিঠিতে লিখিত। বেশ চাঁচাছোলা তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ মন্তব্য সকলও ইহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিত। ক্রমশঃ কিন্তু তাহা সংক্ষিপ্ত হইয়া, কোন্ সময় হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সে সময় নিজের মানসিক বিপ্লবে উদ্‌ভ্রান্তচিত্তা সত্যবতী তাহার খবর লইতেও পারেন নাই। মীনার লেখা চিঠিখানি মিস্ চৌধুরী সত্যবতীকে দেখিতে দিলে, তিনি বুঝিয়াছিলেন শুধু রণেন্দ্র নয়, মতের বদল অমিয়ারও ঘটিয়া গিয়াছে। অমিয়ার সলজ্জ ভাব ও কথাবার্ত্তায় এ সন্দেহ তাঁহার মনেও জাগিয়াছিল; পরিবর্ত্তিত চিঠিতে কেবল স্থির নিশ্চয় হইয়া গেল। এ 'বদ্‌লা' মতের সংবাদে তিনি সুখীই হইয়াছিলেন। তিনি ত এখন খেয়াতরীর পথ চাহিয়া পরপারের যাত্রী হইয়া বসিয়া আছেন; এই পায়ের বেড়ী সংসারানভিজ্ঞা মেয়েটিকে সঙ্গে লইয়া কোথায় পাথেয় সঞ্চয়ে ঘুরিতে যাইবেন? কর্ম্মফল নিজ হইতে যে মুক্তি দিতে চাহিতেছে, এ ত ভালই হইল। মিস্ চৌধুরী বলিয়াছেন—"এ মিলনে দম্পতীকে কখন অনুতপ্ত হইতে হইবে না। এই যে দুইটি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতের নরনারী, ঠিক একই স্থলে গিয়া চিরদিনের বিদ্বেষবুদ্ধি ভুলিয়া পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইল, ইহাতে

বিধাতার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না কি? ইহাকে অবহেলা করিলে সেই অলক্ষ্য মিলনকর্ত্তার শুভ আদেশ অমান্য করা হইবে।”

সত্যবতী যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করিয়া মনে মনে কহিলেন—“হে সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বনিয়ন্তা, তোমার ইচ্ছাই তবে পূর্ণ হউক। মানবের সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র জ্ঞান তোমার অসীম রহস্য কেমন করিয়া উদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইবে?”

সত্যবতীর নিমন্ত্রণ পাইয়া অমিয়ার বাবা আসিলে, সত্যবতী যথাযোগ্য সম্মানের সহিত তাঁহার পরিচর্য্যার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অমিয়ার বিবাহের কথা তুলিলে অমিয়ার বাবা মুখ টিপিয়া একটুখানি শ্লেষের হাসি হাসিয়া কহিলেন—“মেয়ে বড় হইয়াছে বলিয়া সত্যবতীর যে স্মরণ হইয়াছে, ইহাতেই তিনি তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু এখন এ গ্রাজুয়েট্ কন্যার পাত্র সংগ্রহ করা ত আর তাঁহার ন্যায় গরীব গোবেচারি কেরাণীর দ্বারা সম্ভব নহে,—সাধ্যও নহে। এখন কোর্টশিপ—অর্থে, স্বয়ম্বরের আয়োজন আবশ্যক। তাহা শিক্ষিতা কন্যা ও শিক্ষাদাত্রী মাসীমাতার পক্ষে হয় ত অসম্ভব না হইতেও পারে। তিনি এবিষয়ে নিরুপায়।”

পিতার মুখে নিজ কন্যার প্রতি ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া, রাগে সত্যবতীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। কিন্তু নীলকণ্ঠের ন্যায়

সে ক্রোধবিষ তিনি নিজেই পান করিয়া লইলেন। বলিলেন না যে, মাসী তাহাকে যত কুশিক্ষাই দিক্, পিতাও ত তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করেন নাই। অনাথা বিধবার হাতে মেয়ে ফেলিয়া রাখিয়া কখন উদ্দেশও ত লন নাই যে, মেয়ের কি গতি হইয়াছে বা হইতেছে? পয়সা খরচের ভয়ে বিবাহের নামও ত কখন করেন নাই।" এ সব কলহের কথা সত্যবতী একটিও উচ্চারণ করিলেন না। শুধু বলিলেন—"সে জন্যে আপনার কোন ভাবনা নেই। পাত্র আমি স্থির করেই রেখেচি। আপনি কেবল অনুগ্রহ করে দু'হাত এক কর্‌বার অনুমতিটি দিন্। আর কোন ভারই আমি আপনাকে দেব না।"

কন্যাদায় হইতে এত সহজে মুক্তি পাইয়া পিতা এবার আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিয়াই কহিলেন—"বেশ ত তা'হলে আর বিলম্বের আবশ্যক কি? তুমি যখন পছন্দ করেচ, তখন ত আর কথাই নেই। ছেলেটি অবশ্য ভালই হবে। তোমার পছন্দ ত আর যেমন তেমন হ'তে পারে না—সে আমি বিলক্ষণই জানি। তোমার কাছে মেয়ে রেখে যে আমি কত নিশ্চিন্ত ছিলাম, তা ত দেখ্‌তেই পাচ্চ। নৈলে কি আর নিয়ে যেতেম না, না—বিয়েই দিতেম না? ওর মা যে ওকে তোমাকেই দিয়ে গেছে, তোমায় একা

রেখে ওকে নিয়ে যাওয়া ত উচিত হ'ত না, তাই না নিয়ে যাইনি? ওর এ মা ত রোজ বলেন—কবে আমায় মেয়ে এনে দেখাবে। তা বলি, গিন্নি! সবুর কর—শুধু মেয়ে কেন, একেবারে হরগৌরী এনে দেখাব। তা শুভকর্ম্ম এইখানেই হবে ত? নৈলে সে পাড়াগাঁ, সেখানে নানান্ গোল বাধ্‌বে আবার। গিন্নিও তাই বলেন যে, তুমি আমি না হয় মনে কর্‌ব এই ত সেদিনের মেয়ে, ওর আবার বয়স কি? কিন্তু লোকে ত তা বুঝ্‌বে না। মেয়ে গেলে, রথ দোল দেখ্‌বার ভিড় লেগে যাবে। আমাদের হিন্দুঘরে এখনও ত এগুলো তেমন করে চলন হয়নি।"

কথা শেষ করিয়া তিনি সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে শ্যালিকার পানে চাহিয়া দেখিলেন। সত্যবতী শান্তমুখে কহিলেন—"বলেছি ত, ওর জন্যে কোন কষ্টই দেব না আমি আপনাকে। আমার অমি-মার বিয়ে এখানেই হবে বৈকি—আপনি নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন।"

বিবাহের পরদিন অমিয়ার মাথার চুলের উপর হাত রাখিয়া সত্যবতী আবেগ-কম্পিত অশ্রুবদ্ধ গাঢ়স্বরে কহিলেন —"আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি অমি, স্বামী-ভক্তিতে তুমি সাবিত্রীর সমান হও। তোমার মন্দভাগিনী মাসীর দেওয়া সব ভুল, সব কুশিক্ষা এইখানে ফেলে রেখে, তুমি যে

সতীসাধ্বীর কন্যা, তাঁর আশীর্ব্বাদের যেন যোগ্য হ'তে পার। ভগবান তোমার মঙ্গল কর্‌বেন। নারীর বিদ্রোহ কর্‌বার অধিকার নেই মা; শুধু ভালবাসা দিয়ে জয় কর্‌বার সাধনা করাই তাদের কাজ। তোমার শিক্ষা, শুধু ঘরের কাজে নয়, সমস্ত বিশ্বের সেবায় যেন জয়যুক্ত হয়।"